পারাবার

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

আভেনির
২৩৮বি রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৯

প্রথম প্রকাশ
অগ্রহায়ণ ১৩৬৭

প্রকাশক
অমলেন্দু চক্রবর্তী
আভেনির
২৩৮বি রাসবিহারী অ্যাভিনিউ
কলকাতা ১৯

প্রচ্ছদশিল্পী
চন্দ্রনাথ

মুদ্রক
শ্রীরতিকান্ত ঘোষ
দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৭।১ বিন্দু পালিত লেন
কলকাতা ৬

দাম : তিন টাকা

শ্রীমতী অরুণা চট্টোপাধ্যায়

ও

শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়-কে

॥ রচনাকাল ॥

প্রথমাংশ : ১৯৫৪

শেষাংশ : ১৯৬০

কলকাতা

লেখকের অন্যান্য বই

অন্য নগর

এই মর্তভূমি

দূরের মিছিল

মুখর লণ্ডন

প্রদক্ষিণ

নীলকণ্ঠী

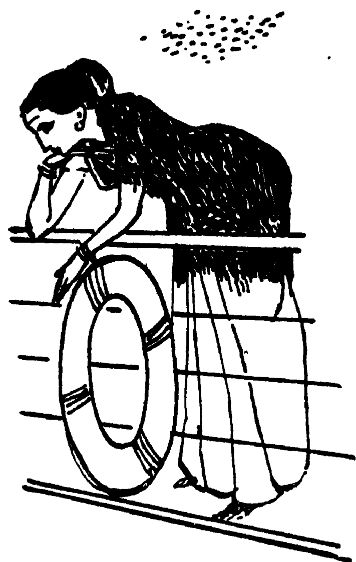
স্মরণচিহ্ন

অন্দর মহল

সোহো স্কোয়ার

অন্তরাল

শ্রীমতী



বাইশ হাজার টনের বিরাট জাহাজ।

এই প্রথম বার ইংল্যাণ্ড থেকে ভারতবর্ষের দিকে পাড়ি দিচ্ছে।

আগে নাকি অন্য জলপথে যাতায়াত করত। তবু জাহাজ একেবারে নতুন। বয়স হয়তো বছরখানেকও নয়।

তাই এই জাহাজের কর্মচারীরা যাত্রীদের একটু বেশি যত্ন করে।

সাদা পোশাক পরা স্টুয়ার্ড আর নীল গাউন পরা অনেক স্টুয়ার্ডেস না ডাকলেও প্রায়ই এসে জিজ্ঞেস করে যায়, কি চাই স্যার ?

যাত্রী ইতস্তত করে বলে, আপাতত কিছু না।

তোমার কেবিনে কিছু ফল রেখে আসব ?

কি দরকার ? এই তো খেলাম—

মেয়েটি হাসে, কাছাকাছি আছি। প্রয়োজন হলেই ডাকবে কিন্তু।

যাত্রী মেয়েটির দিকে ভাল করে তাকিয়ে হেসে বলে, ডাকব। সিগ্রেট খাবে ?

দাও, হাত বাড়িয়ে মেয়েটি বলে, এখন নয়, পরে খাব।

মেয়েদের বয়স বেশি নয়। ওদের বাড়ি হয় পোল্যাণ্ড নয় জার্মানী। অর্থাভাবের জন্যে জাহাজে চাকরি নিয়েছে। দেশে ওদের জন্যে কোন চাকরি নেই। সারা জাহাজ আলো করে সারাক্ষণ ঘুরে বেড়ায়।

কিন্তু ওরা খবর নেবে কি, তরুণ যাত্রীরা ওদের খবর নিতে এত বেশি ব্যস্ত যে মাঝে মাঝে ওই মেয়েরা সব ভুলে নিজেদের ঘরের কথা বলে, অতীতের অনেক গল্প বলতে বলতে তাদের চোখে জল এসে পড়ে।

তারপর এক সময় ওদের মধ্যে কেউ জিজ্ঞেস করে, পরের জন্যে তোমার এত বেদনাবোধ, তুমি কোন দেশের লোক গো ?

ভারতবর্ষের।

সেখানেই তো যাচ্ছে আমাদের জাহাজ!

হ্যাঁ, বম্বেতে নেমে আমাকে ট্রেনে যেতে হবে, আমার বাড়ি কলকাতায়।

কোথা থেকে ফিরছ তুমি?

লণ্ডন থেকে। পড়াশুনো করবার জন্যে চার বছর ছিলাম সেখানে। ভাল চাকরি নিয়ে দেশে ফিরে যাচ্ছি।

সুখী হও!

হাওয়ার ঝাপটায় ঢেউ-এর কয়েক ফোঁটা জল এসে গায়ে লাগে। শুধু ঢেউ আর ঢেউ। চারপাশে কেমন লোনা গন্ধ। রোদ নেই, স্তিমিত ফ্যাকাশে দিন নিঃশব্দে শুধু সমুদ্রের হাহাকার শোনে।

মেয়েটি বলে, যাই, অন্যদের খবর নিই?

আবার এস। নাম বললে না তো তোমার?

অলগা। তোমার?

সমর। মনে থাকবে?

মেয়েটি থেমে থেমে বলল, স-ম-র। একটা কঠিন কাজ খুব সহজে করতে পেরেছে এমনি ভাব দেখিয়ে জয়ের হাসি হেসে অলগা চলে গেল।

বিরাট ডেক। এ-প্রান্তে দাঁড়িয়ে ও-প্রান্তের লোক চেনা যায় না। বিকেল থেকেই লোকের ভিড়ে গমগম করে ডেক। কেউ চেয়ারে বসে স্টুয়ার্ডকে নানা রকম পানীয়ের ফরমাশ করে। কেউ এদিক থেকে ওদিকে ছুটে ব্যায়াম করে। কেউ চুপ করে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। আর কেউ কেউ যাত্রীদের সঙ্গে আলাপ করে—নানা আলোচনা করে।

ছোট হোক, বড় হোক, ছেলে হোক, মেয়ে হোক, জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে আলাপ করা রজার্সের স্বভাব। প্রায় সব চুল পেকে গেছে তার। কিন্তু চেহারা দেখে তার বয়স ঠিক করা

কঠিন। এর মধ্যেই সকলের সঙ্গে সে আলাপ জমিয়ে ফেলেছে। জাহাজের প্রত্যেকটি যাত্রী তাকে চেনে।

বুড়ো বয়সে দেশ ছেড়ে কোথায় চলেছ রজার্স?

বম্বের বয়স্ক ব্যবসায়ী জিতেন পাটনীর প্রশ্নের উত্তরে রজার্স বলে, মেয়ে জামাই আছে আসামে, প্রত্যেক বছরে তাদের দেখতে যাই। তাকে আর কথা বলবার অবসর না দিয়ে রজার্স সেই মেয়েটির সামনে দাঁড়িয়ে তার পথ আটকায়।

মেয়েটির নাম গেইল। খাঁটি ইংরেজ। স্বামী বম্বের হোটেলে বেহালা বাজায়। মেয়েটি প্রায় এক বছর পর স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে। এর আগে ভারতবর্ষে সে আর কখনও যায় নি।

এই গেইল, রজার্স হেসে তার দিকে দুই হাত বাড়িয়ে দেয়, এস, তুমি আর আমি সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ি—

রজার্সের কথা বলবার ধরনই এই রকম। তার কথা শুনে গেইল খিলখিল করে হেসে বলে, কোন দুঃখে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ব? তোমার মতো সঙ্গী যার আছে তার আবার ভাবনা কি গো?

তাহলে তোমাকে নিয়ে কোথায় যাই বল তো?

কেন? এ-জাহাজে এমন সুন্দর বার্ থাকতে আমাদের যাবার জায়গার অভাব?

হ্যাঁ হ্যাঁ সেই ভাল, রজার্স গেইলের হাত ধরে এক ডেক লোকের সামনে দিয়ে হাসতে হাসতে বারের দিকে এগিয়ে যায়।

বুড়ো অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান রসিক আছে দেখছি, অবনী ঘোষালের দিকে তাকিয়ে জিতেন পাটনী হাসে।

অবনী ঘোষাল গম্ভীর স্বভাবের লোক। সকলের সঙ্গে মেশামিশি সে পছন্দ করে না। কারুর ব্যাপারে যেন কোন কৌতূহল নেই তার। তবু জিতেন পাটনীর কথা শুনে একটু অবাক হবার ভান করে সে জিজ্ঞেস করে, লোকটা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান নাকি?

চেহারা দেখে তো তাই মনে হয়।

হ্যাঁ, শুকনো হেসে অবনী ঘোষাল বলে, তা না হলে আর মেয়ে জামাই-এর সঙ্গে আসামে দেখা করতে যায়! যা হোক, আবার বলে অবনী ঘোষাল, লোকটার স্বভাব চরিত্র খুব ভাল নয়, জাহাজের মেয়েদের সঙ্গে বড় বেশি হুড়োহুড়ি করে—

খুব জোরে হেসে জিতেন পাটনী বলে, তুমি বড় কড়া লোক দেখছি। কিছুই তোমার দৃষ্টি এড়ায় না—

আস্তে আস্তে ডেক চেয়ার ছেড়ে অবনী ঘোষাল উঠে দাঁড়ায়। সুরমা কোথায় কি করছে দেখা দরকার। জাহাজে বাজে লোকের অভাব নেই। কার সঙ্গে গল্পগুজব করে ঘনিষ্ঠতা করবে ঠিক নেই।

ওদিকে জাহাজের বার্ তখন একেবারে সরগরম। অনেকেই ভিড় করেছে সেখানে। গেইলের হাত ধরে বসবার ফাঁকা জায়গার সন্ধানে উৎসুক চোখে এদিক ওদিক তাকায় রজার্স।

ওই যে, গেইল তার হাত ধরে টানে, চল রজার্স ওখানে যাই, ওই যে যেখানে ওই ইণ্ডিয়ান মেয়েটা বসে আছে—

হ্যাঁ হ্যাঁ তাই চল, বাঙালী মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রজার্স একগাল হেসে হাত নাড়ে।

বাঙালী মেয়ে মানে মনীষা দত্ত। তিন বছর পর বিলেত থেকে ফিরছে। শুধু রজার্স নয়, এই জাহাজের প্রত্যেকটি পুরুষের সঙ্গে তার ভাব হয়ে গেছে। এমন কি ট্যুরিস্ট ক্লাসের যাত্রীরাও তাকে চেনে।

নামেই ফার্স্ট ক্লাস আর ট্যুরিস্ট ক্লাস। তেমন তেমন যাত্রীরা গ্রাহ্য করে না ওসব ব্যবধান। কোন ক্লাসের প্যাসেঞ্জার সে-কথা তো আর গায়ে লেখা নেই। বলুক না একবার কেউ কিছু—মজা দেখিয়ে দেবে তাহলে। ট্যুরিস্ট ক্লাসের উৎসাহী যাত্রীরা নিয়মিত ফার্স্ট ক্লাসের ডেকে এসে আড্ডা জমিয়ে যায়।

মনীষা ট্যুরিস্ট ক্লাসের এক প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে এর মধ্যে দিব্যি আলাপ জমিয়ে নিয়েছে। তাই তাকে নিয়ে জাহাজে এত হইচই।

তরুণ বাঙালী যাত্রীরা এখানে ওখানে কানাঘুষো করে, আরে মশাই মেয়েটা বাঙালীর নাম ডোবালে! লোকটা ভদ্রলোক হলেও কথা ছিল—একটা থার্ড ক্লাস লোক—ছিঃ ছিঃ!

থার্ড ক্লাস লোক মানে ট্যুরিস্ট ক্লাসের প্যাসেঞ্জার জান্নু। গোলগাল চেহারা, বাবরি চুল, ফরসা রঙ। যুদ্ধের সময় মিলিটারিতে ছিল। দিল্লীর কোন এক ব্যবসায়ীর ছেলে। বাপের ব্যবসার কাজ নিয়ে বিলেত যায়। সেখানে বাপের কি সুবিধা করেছে বলা কঠিন। তবে ফেরবার সময় অনেক কষ্টে ট্যুরিস্ট ক্লাসে ফিরছে। তা না হলে বেচারীর ফেরাই হত না।

বাপ অনেকবার ফার্স্ট ক্লাসের ভাড়া পাঠিয়ে পাঠিয়ে হয়রান হয়ে গেছে। দৈবদুর্বিপাকে ট্যুরিস্ট ক্লাসে ফিরলেও ফার্স্ট ক্লাসের মায়া কাটাতে পারে না জান্নু। সময়ে অসময়ে ডেক চেয়ার টেনে নিয়ে বসে। গেইলকে মদ খাওয়াতে চায়, যার তার সঙ্গে খুশিমতো আবোল-তাবোল বকে, তারপর সকলকে শুনিয়ে বেশ জোরে জোরে আপন মনে গান গায়।

দু-একজন ভদ্রগোছের তরুণ যাত্রী জান্নুর পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। এমন অসভ্য লোকটা কে? গুণ্ডার মতো চেহারা। এ তো ফার্স্ট ক্লাসের প্যাসেঞ্জার নয়। তাহলে এখানে বসে গান গাইছে কেন? কত ভদ্রলোকের মেয়েরা আছে এপাশে ওপাশে। কি ভাববে তারা এ-গান শুনলে?

এই, বম্বের মিস্টার শ্রীনয় জান্নুর সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, তুমি কি ফার্স্ট ক্লাসের প্যাসেঞ্জার?

কেন? কটমট করে তার দিকে তাকিয়ে বেশ কঠিন স্বরে জান্নুও প্রশ্ন করে, তুমি জাহাজের ক্যাপ্টেন নাকি?

এসব অসভ্য গান এখানে গেও না, দেখছ না কত ভদ্রলোক ভদ্রমহিলারা চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে?

তেরা বাপকা জাহাজ হ্যায় রে? জান্নু উঠে দাঁড়িয়ে সটান বম্বের

শ্চিনয়ের মুখের ওপর বলে বসে, আমার খুশি আমি গাইব, বেশি কথা বলবে তো ঘাড় ধাক্কা দিয়ে জলে ফেলে দেব তোমায়—

আর একজন চেঁচিয়ে ওঠে, চোপরও উল্লু!

আর যাবে কোথায়! কোন কথা না বলে জান্নু ধাঁ করে হাত দিয়ে শ্চিনয়ের গালে আঘাত করতে যায়। কিন্তু শ্চিনয় বেগতিক দেখে বিদ্যুৎ বেগে কখন সরে গেছে।

উঃ—শব্দ করে চিৎকার করে ওঠে সেই মনীষা দত্ত। ব্যাপার দেখতে নিঃশব্দে সে কখন ভিড়ের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে কে জানে।

মনীষার চিৎকার শুনে জান্নুর মুখ সাদা হয়ে যায়। এবার আর রক্ষা নেই তার। এদের হাত এড়াতে গেলে সমুদ্রে ঝাঁপ দেয়া ছাড়া উপায় নেই। তা ছাড়া জাহাজ থেকে সে আর কোথায় পালাবে।

গোলমাল হইহই শুরু হয়। ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন এগিয়ে এসে সটান জান্নুর কলার চেপে ধরে, আভি কেয়া হোগা বদমাস?

মেরে দিন একটা ঘুষি বেটার মুখে—

পানিমে ডাল দেও।

ট্যুরিস্ট ক্লাসের প্যাসেঞ্জার এখানে ইয়ার্কি করতে এসেছে। চেহারা দেখেই বোঝা যায় লোকটার মতলব ভাল নয়—

মিস্টার শ্চিনয় করিতকর্মা লোক বটে। ভিড়ের মধ্যে যখন এমনি তর্কাতর্কি কথা কাটাকাটি চলেছে তখন সে একেবারে বাহাদুরের মতো কোথা থেকে খোদ ক্যাপ্টেনকে নিয়ে এসে হাজির।

দ্রুতগতিতে ভিড় ঠেলে পথ করে ক্যাপ্টেনকে একেবারে জান্নুর সামনাসামনি দাঁড় করিয়ে শ্চিনয় বলে, এই যে ক্যাপ্টেন, এই লোকটা আমাদের সকলের চোখের সামনে এই ভদ্রমহিলাকে মেরেছে।— মনীষার দিকে আঙুল দেখিয়ে জান্নুর দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকে বম্বের শ্চিনয় সাহেব।

ইংরেজ ক্যাপ্টেন হলে কি করত বলা কঠিন। এই ক্যাপ্টেনের চেহারা দেখে মনে হয় ভাল মানুষ। মোটা চেহারা, মুখে সরল হাসি। বোধহয় পোল্যাণ্ডের লোক।

ক্যাপ্টেন জান্নুকে ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে থেমে থেমে জিজ্ঞেস করে, তুমি এই ভদ্রমহিলাকে মেরেছ?

ভয়ে ভয়ে জান্নু উত্তর দেয়, না ক্যাপ্টেন—

না মানে? অনেকে একসঙ্গে বলে ওঠে, মিথ্যা কথা বলবার জায়গা পাও নি? আমরা প্রত্যেকে দেখেছি। অত কথায় কাজ কি? এই ভদ্রমহিলাকেই জিজ্ঞেস করে দেখ না ক্যাপ্টেন, মনীষাকে লক্ষ্য করে একজন বলে, কি আপনার নাম মিস্?

মিস দত্ত, মনীষা এগিয়ে এসে প্রায় ক্যাপ্টেনের গা ঘেঁষে দাঁড়ায় এবং তাকে প্রশ্ন করবার অবসর না দিয়ে নিজেই বলে যায়, তোমার যাত্রীরা ভুল করে তোমাকে কষ্ট দিয়েছে ক্যাপ্টেন। ও মোটেই আমাকে মারে নি। আমরা দুজন বিশেষ বন্ধু। আমরা খেলা করছিলাম—

তাই নাকি? মিস্টার শ্রিনয়ের দিকে তাকিয়ে ক্যাপ্টেন হেলে দুলে হেসে চলে যায়।

যারা জান্নুর চারপাশে ঘিরে ছিল মনীষার কথা শুনে প্রথমটায় তারা এত বেশি অবাক হয়ে যায় যে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না। বিমূঢ় দৃষ্টিতে এ ওর মুখের দিকে অনেকক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে থাকে।

কিন্তু তাদের দৃষ্টিকে গ্রাহ্য না করে জান্নুর একটা হাত ধরে মনীষা বলে, এই যে, আর মারবে আমাকে অমন করে? নাও এখন দাও দেখি আমাকে একটা সিগ্রেট—

জান্নু প্রথমে বুঝতে পারে না মনীষা ঠাট্টা করছে কিনা। তাই সে কথার উত্তর না দিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। মনীষা তার বিমূঢ় ভাব দেখে হেসে তাকে একেবারে ডেকের অন্য প্রান্তে নিয়ে যায়।

এস এইখানে দাঁড়িয়ে গল্প করি, কই সিগ্রেট আছে তোমার কাছে ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, জান্নুর এতক্ষণ পর যেন ঘোর কেটে গেছে, এই যে—

অসঙ্কোচে সিগ্রেট ধরাতে ধরাতে মনীষা বলে, মাঝে মাঝে এস, তোমার সঙ্গে গল্প করা যাবে, কোথায় যাবে তুমি ?

দিল্লী।

আমি যাব কলকাতা, একটু ম্লান স্বরে মনীষা বলে, যদিও যেতে আমার এতটুকু ইচ্ছে নেই—

সাহস করে এবার জান্নু জিজ্ঞেস করে, কেন ? তুমি বিলেতেই থাকবে নাকি ?

না না, বিলেতে থাকতে পারলে তো বেঁচে যেতাম !

অন্ধকার তখনও হয় নি। আস্তে আস্তে আলো মিলিয়ে যাচ্ছে। লক্ষ তলোয়ারের মতো দূরে ঝলসাচ্ছে বিক্ষুব্ধ ঢেউ। চোখে মুখে এসে লাগছে নোনা জলের ছিটে। মাঝে মাঝে জাহাজের বাঁশি বাজছে।

মেয়েদের বিলেত যাওয়ার কথা বোধ হয় কোনদিন মনীষার বাড়ির লোকেরা ভাবতেও পারত না। তার মনে আছে, এই সেদিন অবধি, মানে যখন সে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট আর্টসের ছাত্রী তখনও এক পা বাইরে বেরুতে হলে বাড়ির লোককে বলে যেতে হত।

বাড়ির লোক বলতে তার বিধবা মা আর রাশভারী কাকা। কাকীমার কথা ধরে না মনীষা কেননা তিনি অত্যন্ত ভাল মানুষ। সংসারের ভালমন্দ নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামান না। তবু সেই পরিবারে বেড়ে উঠেছে বলে বিলেতে আসবার আগের দিন অবধি মনীষা ভয়ে ভয়ে দিন কাটিয়েছে। তাকে আগলে নিয়ে কাকা ছবি দেখতে গেছে, কোন বন্ধুর বাড়িতে গেলে লোক দিয়ে পৌঁছে দেয়া হয়েছে, বন্ধুবান্ধবের বিয়েতে গেলেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফিরতে হয়েছে।

মা কিংবা কাকার সামান্য অবাধ্য হলে তুমুল কাণ্ড ঘটে গেছে। অবশ্য ইচ্ছে করে বাড়ির লোকের কথার অবাধ্য হবার সাহস কোনদিনই তার হয় নি। সেকথা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। কিন্তু ইচ্ছের বিরুদ্ধে নানা কারণে হয়তো কথার সামান্য এদিক ওদিক হয়েছে। ব্যস তারপর আর রক্ষে নেই। জবাবদিহি করতে করতে তার প্রাণ বেরিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে।

হয়তো সে কারোর জন্মদিনে গেছে। এসব ব্যাপারে এমনিতেই সময়ের কোন ঠিক থাকে না। বেশ একটু এদিক ওদিক হয়। কিন্তু নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেই মনীষা ছটফট করতে আরম্ভ করেছে। কোন ব্যাপারে আর মন দিতে পারে নি। কখনও এমন হয়েছে যে অনেক নেমন্তন্ন বাড়ি থেকে সে না খেয়ে চলে এসেছে। কৈফিয়ত দেবার ভয়ে সে জীবনের অনেক আনন্দ—আহ্বানে সাড়া দিতে পারে নি।

বস্তুতঃ, মনীষার বয়সী মেয়ে যে এমন করে দিন কাটাতে পারে তা সে আজ নিজেই কল্পনা করতে পারে না। মাঝে মাঝে তার ইচ্ছে হয়েছে যে বিদ্রোহ করে বাড়ির সব নিয়ম শৃঙ্খলা সংস্কার চুরমার করে দেয়। কি হবে তাতে? কি করবে বাড়ির লোক? তার যথেষ্ট বয়স হয়েছে, কেউ তো আর তাকে মারতে কিংবা তার ওপর কোন রকম অমানুষিক অত্যাচার করতে সাহস পাবে না।

কিন্তু এমন ভাবনা হবার সঙ্গে সঙ্গেই তার বুক শুকিয়ে গেছে। মা কিংবা কাকা তার ওপর অত্যাচার করবেন না বটে, কিন্তু ফল হবে এই যে তার পড়াশুনো সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হবে আর ভবিষ্যতে সে বাড়ির বাইরে এক পাও বাড়াতে পারবে না। এবং তার মতিগতি ভাল নয় মনে করে তাঁরা অবিলম্বে যে কোন লোকের (তাঁদের মতে সুপাত্র) সঙ্গে তার বিয়ের বন্দোবস্ত করে ফেলবেন।

মনীষার হয়তো এতদিনে বিয়ে হয়েই যেত এবং বাড়ির লোকের ঠিক করা পাত্রের সঙ্গেই। কিন্তু সুখের বিষয় সাধারণের চোখে তার

চেহারা ভাল মনে হয় না। রঙ রীতিমত কালো। আর কাকাকে মনীষা ভাল করেই জানে। ব্যবস্থা করে কালো মেয়ের বিয়ে দিতে হলে আজও বাংলাদেশে যে-পরিমাণ টাকা খরচ করতে হয়, কাকা মনীষার জন্যে তার অর্ধেক অর্থও ব্যয় করবেন না। এবং হচ্ছে হবে করতে করতে মনীষাও একে একে পরীক্ষার বেড়া ডিঙিয়ে যেতে লাগল।

আর একের পর এক যতই সে পরীক্ষার ধাপ অতিক্রম করতে লাগল, বলাবাহুল্য তার জন্যে যোগ্য পাত্র পাওয়া ততই কঠিন হয়ে উঠল। এবং শেষ অবধি কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল মনীষা নিজেও আজও ভাল করে বুঝতে পারে না; মেয়েদের এক বিশেষ স্কলারশিপের বন্দোবস্ত করে সে বিলেত চলে এল।

প্রবল আপত্তি উঠেছিল। মনীষা জানত, উঠবেই। কিন্তু এখন সমস্ত শক্তি দিয়ে সংগ্রাম করে বাধা দেবার মতো মনের অবস্থা হয়েছে তার। এ ব্যবস্থা হবার কিছুদিন আগে, এম. এ. পরীক্ষা শেষ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার মা মারা যান।

মার সঙ্গে মতের হাজার অমিল হলেও মনীষার মনের কোণায় কোথায় যেন একটা বন্ধন ছিল, যার জন্যে অসুবিধা আর অসম্মানের মধ্যে থাকতে হলেও সে চাকরি নিয়ে হোক বা অন্য কিছু করে হোক, এক কথায় এ-বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও যাবার কথা ভাবতে পারে নি। কিন্তু মার মৃত্যুর পর, শুধু এ-বাড়িতে কেন, সারা ভারতবর্ষেই তার আর কোন বন্ধন রইল না।

বিলেতের মাটিতে পা দিয়েই মনীষার সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন এক সঙ্গে সজাগ হয়ে উঠল। হালকা রোদ্দুর ঝলমল করা সকালে আর শীতের প্রায়ান্ধকার মধ্যাহ্নে কিংবা তুষার রিমঝিম করা সন্ধ্যায় ভারতবর্ষ থেকে সাত হাজার মাইল দূরে বসে বার বার সে নিজেকে ধিক্কার দিল।

এতদিন সে যেন অন্ধকূপে কাটিয়ে এসেছে, অপচয় করেছে

জীবনের অনেক মুহূর্ত। নিষেধের বেড়া আর সংস্কারের প্রাচীর তার মনকে এত ছোট করে রেখেছিল যে সে জীবনে মনে রাখবার মতো স্বাদ এক মুহূর্তের জন্যেও গ্রহণ করতে পারে নি। জীবনের দাবীকে স্বীকার করে নেয়া তার কাছে ছিল অপরাধ।

আজও থেকে থেকে একটা ঘটনা প্রায়ই মনে পড়ে মনীষার। সে তখন ফোর্থ ইয়ারের ছাত্রী। ঘটনাচক্রে তার সঙ্গে আলাপ হয় স্নেহবিন্দুর। তাকে ভাল লেগেছিল মনীষার। এত ভাল বোধহয় এর আগে তার আর কাউকে লাগে নি। তার সঙ্গে কথা বলবার জন্যে সে অস্থির হয়ে উঠত, মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার কথা শুনে যেত।

কিন্তু শুধু ওইটুকুই। এর পরে যে আরও কিছু ঘটতে পারে সেটুকু বোঝবার মতো ব্যাপক দৃষ্টি তার তখন ছিল না। তাই হঠাৎ একদিন সব কিছু চুরমার হয়ে গেল। কিন্তু মনীষা জানে স্নেহবিন্দু কোন অপরাধ করে নি। তার সমাদর সে বোধহয় কোনদিনও ভুলতে পারবে না।

একদিন বিকেল বেলা, বন্ধুর জন্মদিনের কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে মনীষা স্নেহবিন্দুর সঙ্গে দেখা করেছিল। ঘরে আর কেউ ছিল না তখন। বাইরে টিপটিপ বৃষ্টি শুরু হয়েছে। যেন অসতর্ক মুহূর্তে স্নেহবিন্দু তার খুব কাছে সরে এল। বুদ্ধিমতী মেয়ে মনীষা আর স্নেহবিন্দুর ব্যবহারে কোনদিন সামান্য অশোভন ইঙ্গিত পায় নি সে।

তবু সেদিন তার সমস্ত শরীর ভয়ে থরথর করে কেঁপে উঠল। অথচ আশ্চর্য সে যেন ওঠবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। আস্তে আস্তে স্নেহবিন্দু খুব শক্ত করে তার একটা হাত চেপে ধরল।

মনীষার ভয় তখন কেটে গেছে, ক্রোধের স্পষ্ট রেখা ফুটে উঠেছে তার চোখে। সেটা লক্ষ্য করবার মতো মনের অবস্থা স্নেহবিন্দুর তখন নয়। মনীষার আরও কাছে সরে এসে সে যেন তাকে কী বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু কথা বলবার অবসর মনীষা তাকে দিল না।

সজোরে তার হাত থেকে নিজের হাত মুক্ত করে নিয়ে বিদ্যুৎ-বেগে উঠে দাঁড়াল।

তারপর হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, আপনি খুব খারাপ লোক। আমি ভাবতে পারি নি, আপনি কখনও আমার সঙ্গে এমন অভদ্রের মতো ব্যবহার করবেন—

স্নেহবিন্দু মনীষার কথার উত্তরে একটি কথাও বলতে পারে নি সেদিন। হয়তো অবাক হয়ে ভাবছিল, অভদ্র ব্যবহার সে করল কখন! কিন্তু তার মনের অবস্থা জানবার কোন কৌতূহল ছিল না মনীষার। সে আর এক মুহূর্তও সেখানে দাঁড়াল না।

ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরে এসে হাঁপাতে লাগল। সেই শেষ। তারপর স্নেহবিন্দুর সঙ্গে আর তার দেখা হয় নি। শুধু স্নেহবিন্দুর সঙ্গে কেন, সেই ঘটনার পর অন্য কোন ছেলের সঙ্গে মনীষা সামান্য ঘনিষ্ঠতাও করে নি। বাড়ির বিধি নিষেধের প্রাচীরের জন্যে তার মনও যেন চাপা পড়ে গিয়েছিল।

স্নেহবিন্দুর ব্যাপারটা হয়তো কিছুই নয়। কিন্তু সেই বোধহয় প্রথম লোক যে লোকাতীত সমাদরে মনীষার সংকীর্ণ মনেও রেখাপাত করতে সক্ষম হয়েছিল। বিলেতে মাঝে মাঝে নিজেকে বিশ্লেষণ করতে করতে সে যখন অতীতের কথা ভাবত তখন তার প্রায়ই স্নেহবিন্দুর কথা মনে পড়ত। মনের দাবিকে এমনি করেই দাবিয়ে রেখেছিল সে। তার বয়স বেড়েছিল কিন্তু জীবনের আহ্বানে সাড়া দেবার মতো সাহস হয় নি।

তাই বিলেতে এসে হঠাৎ মনীষার চোখ খুলে গেল, মন বেড়ে গেল। আর দেশে না পেয়ে পেয়ে সেখানে জীবনকে স্বাধীন দৃষ্টিতে নানাভাবে দেখবার সুযোগ পেয়ে সে এমনি দিশাহারা হয়ে পড়ল যে সহসা ভালমন্দ বিচার করবার ক্ষমতা রইল না তার।

সে যেন রাতারাতি সমস্ত রকম সংস্কার থেকে মুক্ত হতে চাইল। বিদেশী মেয়েদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলাফেরা করতে লাগল আর

সেখানে বাঙালী ছেলেদের দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে তার মনে হল, ও-দেশের ছেলেদের চেয়ে তারা কত পিছনে পড়ে আছে।

একপাশে গেইল আর একপাশে মনীষা, মাঝখানে রজার্স। জাহাজের বার-এ এরমধ্যেই কোলাহল শুরু হয়ে গেছে। কোথাও আর সামান্য বসবার জায়গা খালি নেই। মনীষা ছাড়া আর কোন বাঙালী মেয়ে আসে না এখানে। তাই অজস্র বাঙালীর চোখ তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে।

এমন দৃষ্টিকে আজকাল মনীষা গ্রাহ্য করে না। মাঝে মাঝে সে শুধু অবাক হয়ে ভাবে সপ্ত সিন্ধু পার হয়েও বাঙালী ছেলেদের এতটুকু মনের প্রসার হল না। তারা যেমন ছিল ঠিক তেমনি রয়ে গেল।

আর কি খাবে তুমি? মনীষার শূন্য গ্লাসের দিকে তাকিয়ে রজার্স জিজ্ঞেস করল, আর একটা জিন্ নিয়ে আসি?

না না, রজার্সের হাত ধরে আপত্তি জানিয়ে মনীষা বলল, আজ আর কিছু খেতে পারব না, এরমধ্যেই কি জানি কেন, মাথাটা ঝিম-ঝিম করছে, আমাকে বরং একটা সিগ্রেট দাও রজার্স—

এই যে, সিগ্রেটের কেস্ তার দিকে এগিয়ে দিয়ে গেইলের দিকে ফিরে রজার্স জিজ্ঞেস করল, তোমার জন্যে কি নিয়ে আসব গেইল?

আর একটা জিন আর লাইম, রজার্সের টাই ঠিক করে দিয়ে গেইল বলল, আমাকেও সিগ্রেট দিয়ে যাও রজার্স—

হ্যাঁ, এই যে, সিগ্রেট দিতে গিয়ে তার একটা হাত ধরে রজার্স বেশ জোরে গেয়ে উঠল, তুম তো হ্যায় জঙ্গলকা হরিণী, হামকো গোলি মার—শূন্য গ্লাসগুলি পূর্ণ করে আনবার জন্যে সে এগিয়ে গেল।

মনীষা ভাবছিল এবার উঠে যাবে কিনা। এদের সঙ্গে আর বেশিক্ষণ বসে থাকা ভাল দেখায় না। বার্-এর চারপাশে সে একবার উৎসুক চোখে তাকিয়ে নিল। না, জান্নুকে কোথাও দেখা

যাচ্ছে না। এত দেরি করছে সে? কি হল তার? সে থাকলে না হয় তার সঙ্গে বসে অন্য কিছু খাওয়া যেত।

সেই গান গাইতে গাইতে রজার্স ফিরে এসে সামনের টেবিলের ওপর ঠকঠক শব্দ করে গ্লাস নামিয়ে রাখল। গেইলের জন্যে সে এনেছে জিন আর লাইম, নিজের জন্যে সোডা হুইস্কি আর মনীষার জন্যে শুধু লেমন স্কোয়াশ।

মনীষা আপত্তি জানাল, আমার জন্যে আবার এসব আনলে কেন? আমি যে বললাম আর কিছু চাই না—

তার কথার উত্তর না দিয়ে গেইলের গালে হাত বুলিয়ে সুর করে রজার্স বলল, তুম তো হ্যায় জঙ্গলকা হরিণী, হামকো গোলি মার—

গেইল হেসে তাকে আদর করে বলল, তোমার ভাগ্য ভাল, ভাগ্যিস আমার স্বামী এখানে নেই!

লেমন স্কোয়াশের গ্লাসে চুমুক দিয়ে মনীষা হাসল, থাকলেও কিছু ক্ষতি হত না, রজার্সকে কেউ সন্দেহ করবে না গেইল।

খুব জোরে হেসে রজার্স বলল, আমার পাকা চুল আমাকে সব সময় বাঁচিয়ে দেয়, কাজেই আমি নির্ভাবনায় এগিয়ে যাই—

গেইল কিন্তু রজার্সের কথায় হাসল না। একটু গম্ভীর হয়ে চোখ বড় করে বলল, আমার স্বামী বড় কড়া লোক, কাঁচা পাকা চুল সে দেখে না, যে কোন লোকের সঙ্গে একটু বেশি কথা বললেই আমাকে সন্দেহ করে। ভাবে আমি বুঝি তার সঙ্গে—

গেইলের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মনীষা বলল, যা রূপ তোমার! সন্দেহ তো করবেই।

মনীষার কথা শুনে খুশি হয়ে গেইল এক চুমুকে জিনের গ্লাস খালি করে রজার্সের মুখের দিকে তাকিয়ে চোখের ভাষায় তাকে অনুরোধ করল আরও নিয়ে আসতে।

আচ্ছা রজার্স, মনীষা জিজ্ঞেস করল, তোমার সঙ্গে তো সকলের

আলাপ হয়েছে, জান ওরা করা? ওই যে শিখ ভদ্রলোক আর ওর সঙ্গে যে মেয়েটি—

হ্যাঁ হ্যাঁ খুব চিনি, রজার্সের চোখে বেশ ঘোর লেগেছে, ওর নাম অমর সিং, মেয়েটির নাম ইংগে। স্বামী স্ত্রী ওরা।

মেয়েটিকে কি সুন্দর দেখতে!

দূর, বাধা দিয়ে গেইল বলল, ডেনমার্কের মেয়েরা আবার সুন্দর দেখতে হয় নাকি? দেখছ না কেমন বোকা বোকা চেহারা?

গেইলের মনের ভাব বুঝতে পেরে উত্তর না দিয়ে মনীষা হাসল শুধু। আর ভাবল, সুযোগ পেলে একসময় ওদের সঙ্গে আলাপ করতে হবে। অবাঙালী হলেই তার সঙ্গে আলাপ করবার উৎসাহ জাগে মনীষার। সে জানে বাঙালীরা শুধু তার দোষ ধরে আর সমালোচনা করে তার চলাফেরার। তাই তাদের সে নিজেই অতি সন্তর্পণে এড়িয়ে চলতে চায়।

আস্তে আস্তে অনেক কষ্টে মনীষা উঠে দাঁড়াল। তারপর গেইল আর রজার্সের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে টলতে টলতে কোন রকমে বার্ থেকে বেরিয়ে এল।

তাকে এখন একবার ট্যুরিস্ট ক্লাসে যেতে হবে। কেবিনে গিয়ে রুমাল বদলে নিয়ে খাবার ঘরের পাশ দিয়ে সে আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে লাগল। ট্যুরিস্ট ক্লাসে পৌঁছবার এই সব চেয়ে সহজ পথ।

ওদিকে ডেকের সবকটি আলো একসঙ্গে জ্বলে উঠেছে। পর্বত-প্রমাণ ঢেউয়ের ধাক্কায় জাহাজ হঠাৎ বড় বেশি দুলতে আরম্ভ করেছে। তালে তালে ছুটোছুটি করে খেলা করছে ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল। জাহাজের বাঁশি বাজল কয়েকবার।

ট্যুরিস্ট ক্লাসের ডেকে দাঁড়িয়ে মনীষা একবার চারপাশে তাকিয়ে নিল। কেউ রেলিঙে ভর দিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। কেউ ডেক-চেয়ারে সর্বাংগ এলিয়ে দিয়ে পড়ে আছে।

কেউ ঠিক তেমনি করে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। একেবারে ফার্স্ট ক্লাসের মতো। যাত্রীদের চেহারাও তেমনি।

ফার্স্ট ক্লাসের সঙ্গে ট্যুরিস্ট ক্লাসের হঠাৎ কোনো তফাত করবার উপায় নেই। হতাশ চোখে মনীষা বৃথাই এদিক ওদিক দৃষ্টি বুলোল। না, সে কোথাও নেই। গেল কোথায় লোকটা? রাতারাতি সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল নাকি? শ্লথ পায়ে সে ডেকের অন্য প্রান্তে এগিয়ে যেতে লাগল।

হ্যাঁ, এবার নিঃসন্দেহে শ্রেণী বিভাগের কথা মনে হয়। কত ধরনের লোক যে আছে এই জাহাজে! ভারতবর্ষেরই কত লোক! ইস্ট আফ্রিকায় যারা দোকান খুলেছে, ইংল্যাণ্ডে যারা পরীক্ষায় পাস করেছে, বিদেশে যারা পয়সার মুখ দেখেছে কিংবা উপোস করে দিন কাটিয়েছে—এমনি অসংখ্য লোক এই জাহাজ ভরে তুলেছে। তাদের কোলাহলে মুখর এই ভাসমান অট্টালিকা। তাছাড়া কুলি, খালাসী, ধোপা, নাপিত, ক্যাপ্টেন, পারসার আর অন্যান্য কর্মচারী তো আছেই। সব সুদ্ধ যে লোক কত তার আর হিসেব করে কে!

এর মধ্যেই মেতে উঠেছে সেই বাইশ হাজার টনের কন্টিনেণ্টাল জাহাজ। আর কিছুই দেখা যায় না। শুধু জল আর জল। যতদূর দৃষ্টি যায় গলিত ইস্পাতের মতো জ্বলছে আর তার চঞ্চলতায় যেন উত্তেজনা জেগছে জাহাজের। দুলে উঠছে, নেচে উঠছে, মেতে উঠছে —ভেসে যাওয়ার আনন্দে বুক পেতে নিচ্ছে একের পর এক হাজার ঢেউ।

সমুদ্রের শোভা নিয়ে যারা মাথা ঘামায় না তাদের আসর বসেছে ট্যুরিস্ট ক্লাসের ডেকের এক কোণায়। এদিকে হাওয়া কম, আর অনেক জায়গা জুড়ে বসলেও যাত্রীদের যাতায়াতের অসুবিধা হয় না, এদিকে আসে খুব কম লোক।

অনেক ডেক-চেয়ার এপাশে ওপাশে। এরা সেগুলো এনে জড়ো করেছে এখানে। কিন্তু না আনলেও কোন ক্ষতি ছিল না। কেননা

এর মধ্যেই এরা বের করে ফেলেছে নিজেদের মাতুর, শতরঞ্জি আর চাদর। একটা পুরনো গ্রামোফোনে একের পর এক অনেক হিন্দি গান বেজে চলেছে।

এদের প্রত্যেকের পরনে বিলিতী পোশাক। কিন্তু তবু আরাম করে হাত পা ছড়িয়ে এরা মাতুর আর শতরঞ্জির ওপর বসেছে। কেউ তাস খেলছে, কেউ গান গাইছে আর কেউ পরস্পরের সঙ্গে সুখ দুঃখের গল্প করছে।

কবে ফিরবে ইসমাইল ?

আগে যাই তো দেশে !

কই মেয়ের মা কই গো ?

পাঁচু উত্তর দিল, তার কথা আর জিজ্ঞেস করবেন না দাদা।

এ আর বলাবলি কি, সবাই জানে। একপাল কাচ্চাবাচ্চা তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে সরে পড়েছে তো। এ আর কে না জানে !

যাক ভালই হয়েছে, আধবুড়ো ইসমাইল পাইপ ধরাতে ধরাতে বলল, বাচ্চাদের মা থাকলে তো দেশে ফেরা হত না দাদার আমার ?

শুধু পাঁচু নয়, করিমেরও ওই এক ব্যাপার। মা চলে গেছে দুই মেয়েকে নিয়ে। চারটি ছেলে মানুষ করবার ভার দিয়ে গেছে করিমের ওপর।

পাঁচুর ব্যাপারটা অবশ্য ঠিক এমন নয়। সে-ই তাড়িয়েছে স্ত্রীকে। কিন্তু তবু এদের সামনে মুখ ফুটে কিছু বলল না সে।

আর এক অল্পবয়সী স্বামী স্ত্রী এদের কাছ থেকে একটু দূরে বসেছে। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে নিভৃতে আলাপ করছে। ওরা খুব আস্তে আস্তে চাপা স্বরে কথা বলছিল। বোধ হয় ভয় পাছে এরা কেউ শুনে ফেলে।

তাদের লক্ষ্য করে চেঁচিয়ে উঠল পাঁচু, খুব গল্প হয়েছে ভবসিন্ধু, এবার বউকে নিয়ে ইদিকে আয়।

পাঁচুর স্বর শুনে পায়ের তলায় শেষ হয়ে যাওয়া সিগ্রেট পিষে ফেলে হেসে সিবিলকে ভবসিন্ধু বলল, চল্, ওরা ভাব করতে চাইছে তোমার সঙ্গে।

চোখ টিপে রসিকতা করল ভবসিন্ধুর ইংরেজ স্ত্রী সিবিল, কিন্তু ওরা দলে যে অনেক। সকলকে আমি একা তো সামলাতে পারব না—

এই, আস্তে ডার্লিং, ওরা শুনতে পাবে।

ডেক-চেয়ার ছেড়ে ওরা এসে দলের মধ্যে বসল। অল্প বয়স সিবিলের। একটু বেশি চঞ্চল যেন। সব সময় ছটফট করে। গোল-গাল মোটাসোটা চেহারা।

তার দিকে তাকিয়ে ইসমাইল বলল, খাসা বউ তোমার। কোথায় ছিলে ভাই? লণ্ডনে তো দেখি নি তোমাকে?

ভবসিন্ধুর হয়ে পাঁচু উত্তর দিল, আমাদের ব্যবসা বার্মিংহামে। লণ্ডনে গেছি বটে কয়েকবার।

বেশ বেশ, ইসমাইল আবার জিজ্ঞেস করল, কিসের ব্যবসা ভাই তোমাদের?

কাপড়ের।

আরে আমারও তো কাপড়ের ব্যবসা। কিন্তু হলে হবে কি, বাজার বড় খারাপ। বিলাতে কালা আদমীর বড় মুশকিল।

বার্মিংহামে কোন মুশকিল নাই দাদা। আমরা তো বেশ সুখে ছিলাম।

তোমার বিলাতী বিবি, ওদের দেশের কুকুরটাও তোমার চোখে সুন্দর ঠেকে—কি বল ভাই?

পাঁচু জোরে হেসে বলল, কই আর দাদা, শেষে তো পালাতে পথ পাই না। এখন দুটো ছেলে আর দুটো বাচ্চা মেয়ে নিয়ে কী করি বল?

তা যাও কোথায়? দেশে বাড়ি ঘর আছে?

আছে। পরিবারও আছে একটা। তার ভরসায় তো নিয়ে চললাম সেখানে এই কাচ্চাবাচ্চা।

করিম কথা শুনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল শুধু।

পয়সা কড়ি কেমন হল বল?

কিছু না। রাখতে আর পারলাম কই। যা আছে, যাওয়া আসায় সব তো যাবে। বউএর কাছে বাচ্চাদের দিয়ে আবার ফিরে আসতে হবে। সেই জন্যেই তো যাওয়া—

বিয়াশাদির মধ্যে আর যেও না ভাই।

না না, কি ভেবে ইসমাইলের মুখের দিকে তাকিয়ে পাঁচু বলল, তবে কি জান দাদা, মেমসাহেবরা ভালবাসতে জানে বটে। দিশি মেয়েরা অমন কিন্তু পারে না—

ইসমাইল হেসে বলল, বুঝেছি, মাথা খারাপ হয়েছে তোমার।

সিবিল এদের ভাষা একবর্ণও বুঝতে না পেরে একসময় ভবসিন্ধুর হাত ধরে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চল ওদিকে কোথাও যাই—

হ্যাঁ হ্যাঁ তাই যাও, ইসমাইল স্নেহমাখা স্বরে বলল, দু-হপ্তা হনিমুন কর প্রাণখুলে বুঝলে? আরে ওটা আবার কোত্থেকে এল পাঁচু?

কয়েক পাইন্ট বিয়ার খেয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে জান্নু তখন বেশ জোরে গলা ছেড়েছে।

জান্নু এত জোরে তার বাঁধা গান গাইছিল যে মনীষা দূর থেকে তার গলা শুনতে পেল। এতক্ষণ বৃথা সে এপাশে ওপাশে খুঁজছিল। পাছে আবার সে হারিয়ে যায় তাই মনীষা দ্রুত পায়ে তার পেছনে এসে দাঁড়াল।

এই তুমি কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

চমকে পেছন ফিরে মনীষাকে দেখতে পেয়ে জান্নু বলল, ফার্স্ট ক্লাসে আর যেতে দিচ্ছে না, রাস্তাটা বন্ধ করে দিয়েছে—

দূর, আমি তাহলে এলাম কেমন করে?

মনীষাকে দেখতে পেয়ে জান্নুর নেশা মুহূর্তে কেটে গেছে। সে ভাবতে পারে নি, এখানে এমন করে মনীষা তার খোঁজ নিতে আসবে।

মুখে যা-ই বলুক না কেন জান্নু, তাকে দেখলেও কেমন যেন বিচলিত হয়ে পড়ে, ভেবে পায় না কি কথা বলবে।

চল ফার্স্ট ক্লাসে, আমি নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে সঙ্গে করে, কথা বলতে বলতে মনীষা যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে এগিয়ে যেতে লাগল। জান্নুও চলল তার সঙ্গে সঙ্গে। তাদের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ইসমাইল বলল, ও পাঁচু, ওরা চলল কোথায়?

বড়লোকের মেয়ে দাদা, পাঁচু হেসে উত্তর দিল, কি জানি কী পেয়েছে জান্নুর মধ্যে—

জান্নুটা আবার কে?

ওই যে, যাকে মেয়েটার সঙ্গে দেখলে। বড়লোকের লেখাপড়া জানা মেয়ে। ফার্স্ট ক্লাসের প্যাসেঞ্জার।

করিম বলল, কপাল ভাল জান্নুর, জাহাজের কটা দিন সুখে কাটবে দাদা।

বেশ বেশ, সবাই সুখী হোক, ইসমাইল ভাল করে পাইপ ধরিয়ে নিয়ে হাত পা ছড়িয়ে বসল।

কী না পাওয়া যায় সেখানে! বেশ সুন্দর করে সাজানো দোকান। পালা করে নীল পোশাক পরা জাহাজের মেয়েরা নানা জিনিস আগলে বসে থাকে। সব সময় সেখানে যাত্রীদের ভিড় লেগে আছে। চকলেট, বিস্কুট, জ্যাম, মাখন, টিনের দুধ, মালা, স্কার্ফ, এসেন্স, লিপস্টিক, ছোট বড় নানা দেশের পুতুল, চিঠি লেখবার কাগজ—সবই পাওয়া যায় জাহাজের এই ছোট্ট দোকানে।

সমর নিঃশব্দে এসে অনেকক্ষণ সেই দোকানে দাঁড়িয়ে ছিল। অলগার জন্যে একটা কিছু সে কিনতে চায়। কিন্তু কী কিনবে কিছুতেই ভেবে ঠিক করতে পারছিল না। অবশেষে এদিক ওদিকে তাকিয়ে একটা দামী লিপস্টিক আর একবাক্স চকলেট কিনে তাড়াতাড়ি দোকান

থেকে বেরিয়ে কেবিনের দিকে গেল। রোজ এসময় অলগা এসে তাদের কেবিন পরিষ্কার করে।

দরজা খোলাই ছিল। আর কেউ সেখানে নেই। সকলে বাইরে সমুদ্রের হাওয়া খেতে গেছে। অলগা বোধহয় সমরের জন্যে অপেক্ষা করছিল। তাই তাকে আসতে দেখে হেসে একটু সরে দাঁড়াল।

এই নাও অলগা, সমর অলগার কাছে সরে এসে সে-ছুটো জিনিস বাড়িয়ে দিয়ে বলল, তোমার জন্যে নিয়ে এলাম।

সে ভেবেছিল অলগা খুব খুশি হবে। মুখে আর কিছু না বলুক, অন্তত যথারীতি উচ্ছ্বসিত ধন্যবাদ জানাবে। কিন্তু সে কিছুই বলল না বা করল না। সমর অবাক হয়ে দেখল তার গাল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ছে।

এই তুমি কাঁদছ কেন?

ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে থেমে থেমে অলগা বলল, জ্ঞান হবার পর এত সমাদর আমি কখনও কারোর কাছ থেকে পাই নি—

কথা শুনে নির্বাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে সমর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর এগিয়ে এসে অলগার একটা হাত ধরে বলল, সময় হয় নি তাই পাও নি। কিন্তু ওসব কথা ভেবে এমন করে কাঁদতে নেই। এত বেশি ভাবপ্রবণ হলে শুধু শুধু দুঃখ পাবে—

সব কথার অর্থ বুঝতে না পেরে অলগা বলল, তুমি আমাকে এত ভালবাসছ কেন? আমি যে একজন সামান্য মেয়ে।

সমর হেসে বলল, আমিও একজন সামান্য লোক—

জোর করে হাসবার চেষ্টা করলেও সমরের সব কিছু যেন গোলমাল হয়ে গেল। এতদিন প্রবাসে কাটিয়ে এমন ভাবপ্রবণ মেয়ের কথা সে আজকাল ভাবতে পারে না। সে ভেবেছিল জাহাজের এই কয়েকটা দিন সে অলগার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে বেশ আনন্দে কাটিয়ে দেবে, তারপর কে আর কাকে মনে রাখবে। সারা জীবনে হয়তো দুজনের আর দেখাই হবে না।

কিন্তু তার মন রাখবার জন্যে দেয়া সামান্য উপহার যে এমন আলোড়নের সৃষ্টি করবে সে-কথা সে কল্পনা করতে পারে নি। তাই সে মনে মনে লজ্জা পেল। আর হঠাৎ যেন নিজের কাছে নিজে অনেক বেশি বড় হয়ে উঠল। তাই যেমন করে কথা বলবে ভেবেছিল তেমন করে কিছুই বলতে পারল না। একটু আগে অলগার সঙ্গে যেমন ব্যবহার করবে ভেবেছিল, তার মাত্র একটি কথায় তা করবার কথা আর ভাবতে পারল না। তার কাছ থেকে সামান্য উপহার পেয়ে অলগার চোখে জল জমে উঠেছে। এত সমাদর সে জ্ঞান হবার পর আর কারোর কাছ থেকে পায় নি। একথা শোনবার পর তার কাছে নিজেকে কেমন করে ছোট করে তুলবে সমর!

সেইদিন সব কিছু ভুলে সে অলগার জীবনের অনেক কথা শুনল। একজন স্বল্প পরিচিতা জাহাজের সামান্য মেয়ের জীবন কাহিনী যে সমরের কাছে এমন মূল্যবান হয়ে উঠবে সেকথা একটু আগে তার পক্ষে ভাবা কঠিন ছিল।

জার্মানের বোমায় অলগার মা বাবা মারা যায়। মাত্র বারো বছর বয়সে সে একেবারে পথে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু কার কাছে যাবে সে! পোল্যাণ্ডের ঘরে ঘরে তখন শুধু হাহাকার। কোথাও অন্ন নেই। উপবাসে অনেকদিন অলগা কাটিয়েছে। উপায় না দেখে কয়েকবার চুরিও করেছে। ধরা পড়ে মারও খেয়েছে বহুবার। দিনের পর দিন সহ্য করেছে অবিচার অত্যাচার।

আশ্চর্য্য, তবু আজও সে বেঁচে আছে—আজও সে বাঁচতে চায়।

সমর জিজ্ঞেস করল, জাহাজে কতদিন চাকরি করছ তুমি?

খুব অল্পদিন। এই প্রথমবার আমি ইউরোপের বাইরে যাচ্ছি।

বরাবর তুমি কি জাহাজেই চাকরি করবে?

উপায় কি? আর কিছু বোধহয় আমার করবার নেই। অনেক কাজ করবার চেষ্টা করেছিলাম, এক মিনিট চুপ করে থেকে সে আবার বলল, কিন্তু আর কিছুই তো করতে পারলাম না—

সমর অলগাকে কি বলবে ভেবে ঠিক করতে পারল না। ওর যেন আর কিছু বলবার নেই।

অলগা আবার বলল, অনিশ্চিত জীবনের মধ্যে থেকে থেকে এখন আর আমার কিছুতেই ভয় নেই। নিশ্চিত জীবনের কল্পনা আমি করতে পারি না।

সমর বলল, সকলেরই সমান অবস্থা। কিন্তু এমন করে বেশিদিন চলতে পারে না। সব ঠিক হয়ে যাবে অলগা।

অলগা মৃদুস্বরে শুধু বলল, সেই আশাতেই তো বেঁচে আছি—না হলে বাঁচব কেমন করে বল?

সেদিন অলগাকে আর কিছু বলতে পারে নি সমর। কিন্তু জাহাজের সেই নির্জন কেবিনে অলগার ভিজে চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার জন্যে কিছু করতে না পারার ব্যর্থতায় সমরের দেহমন যেন দুঃসহ যন্ত্রণায় জ্বলতে লাগল।

স্বামীর সঙ্গে অসঙ্কোচে কথা বলতে ভয় লাগে সুরমার। এতদিন ঘর করে আজও অবনী ঘোষালকে সে ঠিক বুঝতে পারে না। শুধু থেকে থেকে তার নিজেকে যন্ত্রের মতো মনে হয়।

অবনী ঘোষাল সুরমাকে লাইব্রেরীতে খুঁজে পেল। চুপচাপ একা বসে সে একটা বিলিতী পত্রিকার পাতা ওলটাচ্ছিল। আরও অনেকে আছে সেখানে। কেউ বই পড়ছে, কেউ সিগ্রেট টানছে, কেউ গল্প করছে।

সুরমার কাছে এসে অবনী জিজ্ঞেস করল, কতক্ষণ এসেছ এখানে?

অনেকক্ষণ।

ডেকে একটু ঘুরে বেড়ালেই তো পার। এখানে বসে সময় নষ্ট করে কি লাভ?

স্বামীর কথায় সুরমা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ডেকে গিয়ে বেড়াই য়্যা?

হ্যাঁ, চল আমিও যাচ্ছি।

স্বামীর কথায় সুরমা ওঠে বসে। তা না করে উপায় নেই। তার মতো সৌভাগ্য কজন মেয়ের হয়। সেসব কথা ভুলতে পারে না সুরমা। আর মাঝে মাঝে ভুলে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তার স্বামী সেকথা মনে করিয়ে দেয়।

সাধারণ মধ্যবিত্ত বাড়ির মেয়ে সুরমা। স্বামীর সঙ্গে বিলেত বেড়িয়ে যাওয়ার কল্পনা সে করতে পারে না।

আরও অনেক কিছু পাওয়ার কল্পনা সে করতে পারে নি। কিন্তু স্বামী তাকে সব দিয়েছে। তার সব অভাব পূর্ণ করেছে। অজস্র মূল্যবান শাড়ি, নানা রকম গয়না, বিরাট গাড়ি—

কী নেই সুরমার! সবই আছে। তাই মাঝে মাঝে তার মনে হয়, এত সুখ কজন মেয়ের হয়! যেটুকু বাকি ছিল তা পূর্ণ হল বিলেতে এসে।

সুরমা ভাবে নি যে হঠাৎ এমনি করে তার বিলেতে আসা হবে। আপিসের কি একটা কাজে কিছুদিনের জন্যে তার স্বামীর বিলেত যাওয়ার কথা সে শুনেছিল। তারপর হঠাৎ শুনল যে তাকেও সঙ্গে যেতে হবে।

বুঝেছ, একদিন গর্বের হাসি হেসে অবনী বলল, ভাবতে পেরেছিলে তুমিও যাবে?

অনেক কিছুই তো সুরমা ভাবতে পারে নি। বিয়ের পর নিজের কিছুই যে অবশিষ্ট থাকে না সেকথাও তার জানা ছিল না। যদি জানত তাহলে হয়তো বিয়ের কথা শুনে তার শরীরে অমন শিহরন লাগত না—অমন করে কাটাত না সে অনেক ঘুমহীন রাত।

তবু নিজের সংসারের সংকীর্ণ পরিবেশে সে নিজেকে ভুলে ছিল। ধরে নিয়েছিল এই নিয়ম। এমনি করেই তাকে কাটাতে হবে সারা জীবন। স্বামীর মঙ্গলের কথা ছাড়া অন্য কথা ভাবতে পারবে না স্বামীর গর্বে গর্ব অনুভব করতে হবে সব সময়।

প্রতিবাদের কথা কোনদিনও মনে হয় নি সুরমার। কার কাছে মুখ খুলবে সে। কিন্তু আজ হঠাৎ যেন তার সমস্ত গোলমাল হয়ে গেছে। তাই মাত্র কয়েক মাস পর দেশে ফিরতে ফিরতে -তার মনে ভিড় করে আসছে অনেক কথা। এমন করে তার তো জীবন কাটাবার কথা নয়।

কিন্তু কোথায় যাবে সে ?

জাহাজের ডেকে কাঠের পুতুলের মতো অবনী ঘোষালের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তার বিলেতের কথা মনে পড়ে যায়। বিলেতের অন্য কোন কিছুই তার মনে দাগ কাটে নি। নানা দৃশ্য আর নতুন জিনিস দেখে এক মুহূর্তের জন্যে উচ্ছল হয়ে উঠতে পারে নি সে। শুধু একটি ছোট ঘটনা তাকে আশ্চর্য রকমের বিচলিত করেছিল। সমুদ্র দেখতে দেখতে সেকথা প্রায়ই মনে পড়ে সুরমার।

লণ্ডনে তার স্বামীর আপিসের এক ইংরেজ কর্মচারীর বন্ধুর বাড়িতে তারা থাকত। বয়স বেশি নয় তার। নাম লেজলি। খুব সুন্দরী দেখতে তার স্ত্রী। নাম জোসেফিন।

খুব ভাব লেজলি আর জোসেফিনের। এত ভাব যে তাদের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে সুরমা অনেকবার ভেবেছে—স্বামী স্ত্রী এমন বন্ধুর মতো থাকে কেমন করে। লেজলি কোনদিনও স্ত্রীকে প্রতাপ দেখায় না, জোসেফিন কখনও স্বামীকে দেখলে ভয় পায় না। কেউ কারোর ক্রুটী ধরবার জন্যে কখনও ব্যস্ত হয় না।

লেজলিকে দেখে আর অবনী ঘোষালের কথা ভাবে। জোসেফিনের সঙ্গে গল্প করে আর নিজেকে নিয়ে মাথা ঘামায়। সে পরম আগ্রহে লক্ষ্য করে কেউ কারোর স্বাধীনতায় কখনও হাত দেয় না। জোসেফিনের অনেক বন্ধু-বান্ধব আসে। লেজলি আপিসে বেরিয়ে গেলে মাঝে মাঝে সেও বেরিয়ে যায়।

ফিরে এসে সুরমাকে বলে, জান আজ আমার এক বন্ধুর সঙ্গে অনেক দূর বেড়াতে গিয়েছিলাম।

সুরমা প্রথমে ভাবে জোসেফিন হয়তো তার কোন মেয়ে বন্ধুর সঙ্গে কোথাও গিয়েছিল। কিন্তু পরে কথায় কথায় জানতে পারে, না, মেয়ে নয় ছেলে। বিয়ের অনেক আগে থেকে তার সঙ্গে জোসেফিনের আলাপ। তাকে একদিন দেখল সুরমা। তার নাম উইলিয়াম।

একদিন সুরমা অবনী ঘোষালকে বলল, কেন এমন হয়? ওদের এত ভাব তবু জোসেফিন কেন উইলিয়াম-এর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে?

স্ত্রীর দিকে বিরক্তির দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অবনী বলল, বিলেতে দেখবার আরও অনেক জিনিস আছে—শুধু জোসেফিনের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামিও না।

সব ব্যাপারেই স্বামী তাকে এমন কঠিন নির্দেশ দেয়। অথচ আশ্চর্য, জোসেফিন আর লেজলির সঙ্গে যখন কথা বলে তখন সে যেন অন্য মানুষ হয়ে যায়। কেন তাহলে সুরমার সঙ্গে কথা বলবার সময় সে অমন কঠিন হয়ে পড়ে।

সুরমা তবু লেজলিকে দেখে আর জোসেফিনের সঙ্গে তার ব্যবহার দেখে অবাক হয়ে যায়। কিন্তু কিছুদিন পর সে আরও অবাক হয়ে গেল। সে-বাড়ি ছাড়তে হল তাদের।

অর্থাৎ লেজলি আর জোসেফিনের-এর বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। ভেতরে ভেতরে এত কাণ্ড চলেছে অথচ আশ্চর্য বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় নি। কখন এরা গোলমাল করল, কখন এরা বিচ্ছেদের কথা ঠিক করল—কিছুই ভেবে পায় না সুরমা।

অবনী ঘোষালকে সুরমা আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। জোসেফিন যখন তার সঙ্গে দেখা করে বিদায় নিতে এল তখন সে না বলে পারল না, কিছু মনে কোরো না, কেন এমন হল?

যেন কিছুই হয় নি এমন ভাবে হাসল জোসেফিন, কী আবার হল? একটু চুপ করে থেকে সে বলল, আমরা মানিয়ে থাকতে পারলাম না।

কিন্তু কেন? এত ভাব তোমাদের!

কেন জানি না। তবে লেজলি বড় স্বার্থপর। সব সময় শুধু নিজের কথা ভাবে। আমারও যে একটা ব্যক্তিগত জীবন আছে সেকথা সে ভুলে যায়।

কিন্তু সে তো সব সময় তোমাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে—

হ্যাঁ। যতক্ষণ সে বোঝে আমিও তাকে নিয়ে ব্যস্ত আছি ততক্ষণ সে খুশি থাকে। কিন্তু আমার অন্য বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে আমি যখন দেখা করতে যাই তখন সে খুশি হয় না।

সুরমা আস্তে বলল, দেখা না করলেই তো পার।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে জোসেফিন বলল, সেকথা আমি ভাবতে পারি না। কেন দেখা করব না?

স্বামীকে ভালবাসলে সে যা না চায় তা করবার দরকার কী?

আমার ছোট খাট ভাল লাগাকে স্বামী প্রশ্রয়ই বা দেবে না কেন? একটু থেমে জোসেফিন বলল, কেউ যদি আমার স্বামীর চেয়ে আমাকে বেশি ভালবাসে, স্বামীর কথায় তাকে হঠাৎ একেবারে অস্বীকার করবার মতো শিক্ষা আমার নয়।

জোসেফিনের কথা শুনে কিছুক্ষণ সুরমা অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। নিজের কথা এমন করে ভাববার সাহস তার নেই কেন? কি পেয়েছে সে অবনীর কাছ থেকে—শুধু বিধি নিষেধের কড়া শর্ত স্বামী সব সময় সুরমার সামনে মেলে ধরে। এক চুল এদিক ওদিক হলে আর রক্ষা নেই।

জোসেফিন আরও বলেছিল, মনের সম্পর্কে যেখানে সন্দেহ জেগেছে সেখানে এক মুহূর্তও থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তার চেয়ে বাইরে বেরিয়ে ভবিষ্যতে অন্য কারোর সঙ্গে ঘর করলে আমি হয়তো অনেক বেশি শান্তি পেতে পারি।

একজন মেয়ের মুখ থেকে এমন কথা শুনে সমস্ত গোলমাল হয়ে গিয়েছিল সুরমার। সে কেন এমন করে ভাবতে পারে না। কেন জগদ্দল পাথর বুকে নিয়ে সে কাটাচ্ছে দিনের পর দিন।

সমুদ্র গর্জন করছে। গম্ভীর স্বামীর পাশে ডেকে দাঁড়িয়ে সুরমার হঠাৎ জোসেফিনের কথা মনে পড়ল। হঠাৎ যেন সমুদ্রের মতো অমনি গর্জন করতে ইচ্ছে করছে তার।

বারোটা বাজতে খুব বেশি দেরি নেই।

আজ জ্যোৎস্নায় ভরে গেছে সারা সমুদ্র। বিপাশা তেমনি করে একা ডেকে দাঁড়িয়ে ছিল। তার চেনা-শোনা সকলে একে একে কেবিনে চলে গেছে। শুধু দূরে গেইল এখনও রজার্সের হাত ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আর ইংগে অমর সিং-এর সঙ্গে ডেক চেয়ারে বসে আছে। এদের সকলের সঙ্গেই বিপাশার আলাপ হয়েছে। ইংগে, গেইল, সুরমা, মনীষা, রজার্স, অবনী এমন কি জান্নুর সঙ্গেও সে অনেক কথা বলেছে।

সমর আর অলগার ব্যাপারটাও সে কিছু কিছু শুনেছে। মনীষার সঙ্গে একদিন ট্যুরিস্ট ক্লাসে গিয়ে ইসমাইল, পাঁচু, ভবসিন্ধু আর সিবিলের সঙ্গেও আলাপ করে এসেছে। মন্দ লাগছে না বিপাশার এদের সকলের পাশে নিজেকে দাঁড় করিয়ে তার নিজের জীবন বিশ্লেষণ করে দেখতে। তা ছাড়া এই জাহাজে আর কি করতে পারে সে!

তবু তার নিজের মনে অনেক কথা জমা আছে। সেকথা কাউকে বলতে পারে না। সে তার একান্ত আপনার কথা। এমন একদিন ছিল যখন পাঁচজনকে সাগ্রহে সে তার কথা বলে বেড়াত। কিন্তু আজ!

একটু আগে কোন বন্দর থেকে জাহাজ ছেড়েছে। আস্তে আস্তে দূরে সরে যাচ্ছে আলোগুলি। আর একটু পরে ওগুলোকে মনে হবে আলোর বিন্দু। তারপর ওরা মিলিয়ে যাবে অন্ধকারে। চেয়ে থাকতে থাকতে ঘোর লেগে যায় বিপাশার। সে যেন কেমন অস্বস্তি অনুভব করে।

উচ্ছল ঢেউএর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে আনমনা হয়ে যায়। তার কিছুই খেয়াল থাকে না। বয়লারের গমগম শব্দ হচ্ছে, ধোঁয়ার কুণ্ডলী ওপরে উঠছে, জাহাজ দুলে দুলে উঠছে।

অনেক দিন পর বিপাশা দেশে ফিরে যাচ্ছে। কিন্তু যখন প্রথম বিলেত যায় তখন দেশে ফেরবার ইচ্ছে তার ছিল না। সে ভেবেছিল একটা চাকরি-বাকরি যোগাড় করে পৃথিবীর নানা দেশ দেখে বেড়াবে।

মেয়েদের পক্ষে অকস্মাৎ এমন কল্পনা করা হয়তো একেবারেই অস্বাভাবিক। কিন্তু বিপাশা কোনদিনও সাধারণ মেয়ের মতো দিন কাটাতে পারে নি। তার জীবনটাই অসাধারণ। আজ বিলেত থেকে জলপথে দেশে ফিরতে ফিরতে বিপাশা উচ্ছল ঢেউএর দিকে তাকিয়ে সেকথা প্রথম থেকে শেষ অবধি ভেবে দেখবার চেষ্টা করে।

মার কথা তার ভাল মনে পড়ে না। খুব ছেলেবেলায় সে মাকে হারায়।

বাবার অকৃপণ স্নেহ বিপাশার জীবনে আশ্চর্যরকম প্রভাব বিস্তার করে।

বস্তুতঃ ব্রজকিশোরকে সে আদর্শ মানুষ বলে মেনে নিয়েছিল। ব্রজকিশোর ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ। বইএর দেয়াল দিয়ে তাঁর পৃথিবী ঘেরা থাকলেও তিনি মেয়েকে সেই পৃথিবীতে মানিয়ে নিতে শিখিয়েছিলেন।

তাই বিপাশার জীবনে ব্যক্তিগত স্বার্থ কখনও বড় হয়ে ওঠে নি। বাবার মুখ থেকে সময়ে অসময়ে নানা মনীষীর নানা মত শুনতে শুনতে সে জীবনের তুচ্ছ পাওনা নিয়ে মাথা ঘামায় নি। বিপাশার কথা ভেবে ব্রজকিশোরও কখনও ব্যস্ত হন নি।

বস্তুতঃ মেয়ে থাকলে যে তার বিয়ের ভাবনা ভাবতে হয় সেকথা তাঁর খেয়াল থাকত না। আত্মীয় বন্ধুরা তাঁকে সেকথা মনে করিয়ে দিলে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়ে তিনি বলতেন, তাই তো বড় ভুল হয়ে গেছে, ছি

ছি কী অন্যায়। নাঃ, আজ থেকেই উঠে পড়ে লাগতে হচ্ছে, কেউ আছে নাকি তোমাদের জানাশোনা ভাল ছেলে?

বন্ধুরা হেসে বলত, ভাল ছেলে নিয়ে তো আপনারই কারবার, আপনি যেমন ছেলের খবর পান তেমন ছেলে আমরা কোথায় পাব?

তাই তো, কাল থেকেই চেষ্টা করব।

কিন্তু ওই অবধি। যথাসময় তিনি মেয়ের বিয়ের কথা ভুলে বসে থাকতেন। নিজের পড়াশুনো, কলেজের কাজ আর ভবিষ্যৎ শিক্ষা প্রণালীর কথা চিন্তা করতে করতে বিপাশার কথা তাঁর মনেও থাকত না।

আর পাঁচজন মেয়ে যেমন করে নিজের বিয়ের ভাবনা ভাবে বিপাশা তেমন করে কোনদিনও ভাবে নি। পার্থিব কোন কিছুতেই বোধ হয় তার আকর্ষণ ছিল না। তার অদ্ভুত স্বভাবের কথা ভেবে মাঝে মাঝে সে নিজেই অবাক হয়ে যেত। এমন বন্ধনহীন মন তার হল কেন!

বিপাশার মনে হত তার নিজের কোন বন্ধন থাকবে না, কখনও কোন স্বার্থ তাকে অন্ধ করে রাখবে না। সে বিশেষ কারোর হবে না কিন্তু সকলের হবে। সব ছেড়ে, বাবাকে রেখে, বাড়ি ফেলে তার অনেক দূরে চলে যেতে ইচ্ছে করে। সব মেয়ে যা চায় বিপাশা তা চায় না—সে আরাম চায় না, ঘর বাঁধতে চায় না। অনেক দুঃখীর দুঃখের বোঝা মাথায় নিয়ে সে তাদের মধ্যে থাকতে চায়।

যখন ব্রজকিশোর কলেজে থাকেন তখন নিঃসঙ্গ বিপাশা রেডিও-গ্রামে প্রায়ই মীরার ভজন বাজিয়ে শোনে। আর শুনতে শুনতে তার সমস্ত শরীর আবেশে অবশ হয়ে যায়। সব ছেড়ে তার কিসের সন্ধানে ছুটে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে করে।

না, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সন্ধানে নয়। কিন্তু তার মনে হয় ঘরে সে থাকতে পারবে না, সংসার তার জন্যে নয়। ঘর বাঁধবার স্বপ্ন বিপাশা কোনদিন দেখে নি। তার মনে হয় এই পৃথিবীতে যত দুঃখী আছে সে

তাদের প্রত্যেকের কথা শুনবে, সে থাকবে হাহাকারের মাঝে। থেকে থেকে তার মনের গহন থেকে একটা করুণ সুর বেজে ওঠে।

এমন এক পরিবেশে সে মানুষ যেখানে শান্তি আছে কিন্তু আনন্দ নেই। মা যখন মারা যান, বিপাশার স্পষ্ট মনে আছে সেদিন সে ব্রজকিশোরের চোখে জল দেখেছিল। আজও যেন সে-জল শুকিয়ে যায় নি। হয়তো এই কারণেই বাবাকে তার মহামানব বলে মনে হয়।

তবু সব ছিল সংসারে। স্নেহ অর্থ কিছুরই অভাব ছিল না। কিন্তু আনন্দ ছিল না। বাবার জীবনযাত্রা দেখতে দেখতে বিপাশা বোধহয় নিজের সুখের কথা ভুলে ছিল। সে কেবলই মনে মনে প্রার্থনা করত যেন কখনও সে নিজের স্বার্থের কথা ভেবে অন্য কাউকে বঞ্চিত না করে। বরং সে চাইত পরকে সুখী করবার জন্যে প্রয়োজন হলে সে যেন সব ছেড়ে, সব তুচ্ছ করে বেরিয়ে পড়তে পারে।

বোধ হয় তার এমনি আশ্চর্য স্বভাবের জন্যে তার বন্ধু-বান্ধব একেবারেই ছিল না। কারোর সঙ্গে তার মতের মিল হত না মনের মিল হত না। বিপাশা বাবার সেবা করে আপনার পৃথিবীতে আপন মনে ঘুরে ফিরত। আর তখন তার কানে বাজত একের পর এক মীরার ভজন।

কত বছর আগে এই পৃথিবীতে এসেছিল এক মহীয়সী নারী। মেবার রাজপ্রাসাদের অলিন্দ সহসা বিপাশার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

প্রাসাদে চলেছে আনন্দ উৎসব। চারপাশে কত বীরের তরবার —কত রূপসীর অপরূপ সজ্জার ঘটা।

কিন্তু মীরা সেখানে নেই। কোথায় গেল সে! তাকে দেখতে এসেছে কত অসংখ্য মানুষ। রাজকুমার ভোজরাজের মুখে বিরক্তির রেখা ফুটে উঠল। নিঃশব্দে তিনি বধূর সন্ধানে অন্দর মহলে চলে এলেন।

বাইরে অপূর্ব আলোর মেলা কিন্তু অলিন্দে তখন আবছা আবছা অন্ধকার। মীরা তন্ময় হয়ে গাইছে—

ম্যয় হরি চরণনেকা দাসী
দুঃখ কষ্ট মান অপমান
কুটিল জগৎ কি হাসি—

ভোজরাজের সারা শরীর অব্যক্ত যন্ত্রণায় কাঁপতে লাগল। কি করবেন তিনি—কোথায় যাবেন! ইচ্ছে হল মীরার হাত থেকে বীণা কেড়ে নিয়ে চুরমার করে দেন।

কিন্তু কিছুই করতে পারলেন না। যেমনি নিঃশব্দে এসেছিলেন আবার ঠিক তেমনি করেই ফিরে গেলেন।

বিপাশার প্রায়ই এমনি অনেক কথা মনে পড়ে। সেও ভাবে কোন কাজ নিয়ে তন্ময় হয়ে থাকবে, দিনরাত মেতে থাকবে। কোন রাজকুমার তাকে এক তিলও টলাতে পারবে না, ঐশ্বর্যের আকর্ষণে সে স্বার্থপর হয়ে উঠবে না।

তারপর কোথা থেকে কী হয়ে গেল বিপাশা ভাল বুঝতে পারে না। যখন বুঝল তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। আগে বুঝলেও সে হয়তো ব্রজকিশোরকে মুখের ওপর কিছু বলতে পারত না।

ভাল ছাত্র অসিত। একদিন ব্রজকিশোর তার সন্ধান পেলেন। তাকে দেখেই তাঁর হঠাৎ বিপাশার কথা মনে পড়ে গেল। তাঁর মনে হল, সত্যিই তো বড় দেরি হয়ে গেছে। কিছুতেই আর দেরি করা যায় না।

একদিন হাসি মুখে তিনি বিপাশাকে বললেন, বন্ধুরা আমাকে দোষ দেয়। বলে, আমি নাকি তোর বিয়ের জন্যে মোটেই ব্যস্ত নই। কিন্তু ভাগ্যিস দেরি করেছিলাম, একটু থেমে ব্রজকিশোর বলেছিলেন, তাই তো অসিতের মতো ছেলে পাওয়া গেল—

বাধা দিয়ে বিপাশা বলেছিল, কিন্তু তোমার মতো বাবা যে একেবারেই পাওয়া যায় না—তোমাকে আমি কার হাতে দিয়ে যাব বাবা?

পাগলি, মেয়ের মাথায় পরম স্নেহে হাত বুলিয়ে ব্রজকিশোর বলেছিলেন, আমার জন্যে তুই কি চিরকাল বিয়ে না করে থাকবি?

তোমাকে কে দেখবে বাবা?

একটু ভেবে ব্রজকিশোর বলেছিলেন, ভবর মা রয়েছে। আর তোর পিসিমাকেও আনিয়ে রাখব ভাবছি। আমি সব ঠিক করে ফেলেছি মা।

এদিকেও ব্রজকিশোর সব ঠিক করে ফেলেছিলেন। বোধহয় প্রথমবার বিপাশা বাবাকে খুশিতে উচ্ছল হয়ে ছেলেমানুষের মতো ছুটোছুটি করতে দেখল।

তার মা বেঁচে থাকলে সে কি করত বলা যায় না। হয়তো প্রতিবাদ করত, জেদ ধরত, মুখ ফুটে স্পষ্ট বলত, আমি বিয়ে করব না, আমি কারোর সংসারে গিয়ে কোনমতে কোন দায়িত্ব নিতে পারব না—

কিন্তু বাবাকে সে কিছু বলতে পারল না। কী ভাববেন তাহলে ব্রজকিশোর কে জানে। ভুল বুঝে হয়তো তিনি শুধু শুধু আঘাত পাবেন। আর এক্ষেত্রে বিপাশার নিজেকে স্বার্থপর মনে হল।

তবু সেদিন একটা কিছু বিপাশার বলা উচিত ছিল ব্রজকিশোরকে। নতুন সংসারে গিয়ে কোন দায়িত্ব নেয়ার কথা নয়—প্রচলিত রীতিনীতি আর আজকের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনধারার সঙ্গে তার যে আগাগোড়া অমিল সে-কথাটা তাঁকে কৌশলে আস্তে আস্তে জানিয়ে দিলে হয়তো এত শিগগির কোন আয়োজন তিনি করতেন না।

নতুন একজন মানুষের সংসারে সে ঘুরে বেড়াবে দম-দেয়া একটা পুতুলের মতো। রোজকার ছোট ছোট পাওনা নিয়ে কখনও হাসবে—কখনও কাঁদবে। স্বপ্ন গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে। পরিধি হয়ে আসবে সংকীর্ণ।

আর একজন—সে যেই হোক, বাইরের লোক তাকে যত মূল্যই দিক—বিপাশার জীবনে যদি সে কোন রেখাপাত না করতে পারে

তাহলেও তাকে পরমাত্মীয় বলে মেনে নিতে হবে। তার নির্দেশে ভরে রাখতে হবে সারা দিন—সারা রাত।

আর যদি—একটা চমক লাগে বিপাশার শরীরে—একটি-একটি করে সে শৃঙ্খলের গিঁঠ কেটে দিয়ে খাঁচা থেকে পাখির মতো হঠাৎ বেরিয়ে আসে তাহলে তাকে দেখার কৌতূহল জাগবে অসংখ্য মানুষের। তাদের সে-দৃষ্টি তুচ্ছ করবার ক্ষমতা বিপাশার থাকলেও ব্রজকিশোরের যে থাকবে না সে-বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ। তাই দ্বিধা থাকলেও আজকের নিয়ম মানতেই হল বিপাশাকে।

কেন এমন করে তার স্বার্থ নিজের কাছে বড় হয়ে উঠবে! না, বাবাকে সে কিছুতেই দুঃখ দেবে না। কাউকে ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যে আঘাত দেওয়ার চেয়ে নিজে দুঃখ পাওয়া অনেক ভাল।

পাত্র হিসেবে অসিত যে প্রথম শ্রেণীর সেকথা বিনা দ্বিধায় বলা চলে। অর্থের প্রাচুর্যের ছাপ ঘরের দেয়ালে দেয়ালে। আর লোক হিসেবে যে তাকে দেখে সেই মুগ্ধ হয়।

কিন্তু চারপাশে তাকিয়ে বিপাশার শুধু মেবার রাজপ্রাসাদের কথা মনে হয়। বুকের মধ্যে একটা বিরাট শূন্যতা অনুভব করে সে। না, কিছুতেই এই রাজকীয় ঐশ্বর্যের মধ্যে সে থাকতে পারবে না। এখানে বেশিদিন থাকলে তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু কেন?

যতদিন বাবার কাছে ছিল ততদিন মানুষের স্বার্থপরতার রূপ তার চোখে পড়ে নি। আপনভোলা মানুষ ব্রজকিশোর। তবু তাঁর সূক্ষ্ম অনুভূতি বিপাশাকে মুগ্ধ করেছিল।

বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বাবার প্রতি তার শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গিয়েছিল। শুধু মায়ের স্মৃতি সম্বল করে ব্রজকিশোর কাটিয়ে চলেছেন দিনের পর দিন। কখনও কোন কিছুর মাধ্যমে নিজেকে জাহির করবার চেষ্টা করেন নি।

আর এখানে—অসিতের প্রাসাদে কাঁপে জীবনের ফিকে হালকা নানা রঙ। যে-জীবনকে বিপাশা একদিন খুঁজেছিল নিজের মধ্যে—

ছেড়ে যাওয়ার তীব্র অনুভূতির আনন্দে—যে-জীবনের সন্ধান সে পায় নি কিন্তু কখনও কখনও অসহ এক যন্ত্রণায় তার ভাসা-ভাসা রূপ ঝলসে উঠত চোখের সামনে—এখানে তা নেই।

এখানে আছে স্থূল বিলাসের কম্পমান প্রলোভন। সঞ্চয় লিপ্সা। যত বড় প্রলয় হোক না কেন পৃথিবীতে—শুধু দুজন মানুষ চোখ কান বন্ধ করে থাকবে—অসিত আর বিপাশা। ক্ষুধার্ত মানুষের হাহাকারে আকাশ কেঁপে উঠলেও সেই দুটি মানুষের আহার্যের কোন অভাব হবে না।

বিয়ের পর প্রথম-প্রথম এক-একদিন এক-একটা সুসংবাদ বহন করে আনত অসিত, পঁচিশ হাজার টাকার আপাতত করালাম—

কি ?

ইনসিওর, গর্বের হাসির ঝিলিকে ঠোঁট কাঁপত অসিতের, আরও একটা মোটা পলিসির আমি শিগগিরই ব্যবস্থা করছি—

খুব আস্তে বিপাশা জিজ্ঞেস করত, কেন ?

ভবিষ্যতের জন্যে, হাসিমুখে বিপাশার কাছে সরে আসত অসিত, আমরা দুজন চিরকাল তো একা থাকব না। আর ধর, একটু চুপ করে থেকে সে বলত, যদি হঠাৎ একদিন আমি চলে যাই—

কোথায় ?

ধর যদি মরে যাই ?

শুরুতেই ও-কথা শোনাও কেন ? অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিত বিপাশা। অসিত থাক না থাক—তার সামনে থেকে একটু-একটু করে সে যেন অনেক দূরে সরে যাচ্ছে। কোথায়—তা সে নিজেই জানে না। শুধু যন্ত্রণার একটা শিহর কঠিন করে তুলত তার মুখ।

অসিত আরও সরে এসে বিপাশার একটা হাত ধরত, আমি ঠাট্টা করলাম বিপাশা। ঠাট্টা বোঝ না কেন ?

তখন হাত ছাড়িয়ে যেন বিপাশা অসিতের ছোঁয়া বাঁচাত, তোমার সব কিছুই আমার ঠাট্টা বলে মনে হয়—

হা-হা করে হাসত অসিত, তাহলে সারাদিন কেন তুমি গাম্ভীর্য দিয়ে তোমার বয়স বাড়িয়ে তোল ?

কারণ—বিপাশা কথা শেষ করত না। থেমে যেত। যেন মৃত্যুর হিমস্পর্শ লেগেছে তার শিরায়-শিরায়। চোখের সামনে থেকে আলো মিলিয়ে যাচ্ছে। তাকে সচেতন স্বার্থপর গৃহিণী করে তোলবার জন্যে হিমসিম খাচ্ছে অসিত।

স্বার্থের বিন্দু-বিন্দু সঞ্চয় দিয়ে দৃঢ় করে তুলছে সংসারের গণ্ডি। দম্ভের মুখোশ পরে তার মনের কাছে এগিয়ে আসবার বৃথা চেষ্টা করছে।

এ-সংসার যন্ত্রণা দেয় বিপাশাকে। এ-মানুষটা তিল তিল করে মারে। বিশাল জগতের আহ্বান তার কানে আর পৌঁছবে না। অন্য কারুর কথা ভাববার আর কোন অধিকার নেই তার। তার স্বামী আর সংসার। আর ভবিষ্যতে আসবে ভাবনার এক-একটি প্রতীক—এক-একটি সন্তান।

সংসারের স্বার্থে নিজেকে কেমন করে চুরমার করবে বিপাশা !

অসিত তাকে প্রায়ই বলত, শুধু কি চাই তোমার বল ? একবার মুখ থেকে কথা খসিয়ে দেখ আমি তোমাকে তা দিতে পারি কি না ? কি চাই শুধু বল ?

বিপাশা সহসা উত্তর দিতে পারত না। তার বুকের ভেতর যন্ত্রণায় টনটন করে উঠত শুধু। কিছুক্ষণ পর মাথা তুলে সে বলত, আমি কোথাও চলে যেতে চাই—

কোথায় ? মুসুরী ? দার্জিলিং ? কলকাতা ভাল লাগছে না বুঝি ? দাঁড়াওনা, দু দিন পর তোমাকে একেবারে বিলেত ঘুরিয়ে আনব।

বিপাশা আবার বলত, আমি একা যেতে চাই।

একা ? অসিত একটু অবাক হয়ে যেত যেন, এ-বাড়িতে বুঝি বড় বেশি গোলমাল ? দাঁড়াও তোমার জন্যে ছাদে একটা ঘর তৈরি করে দিচ্ছি। মার্বেলের মেঝে হবে, চোদ্দ পনেরো হাজার টাকা খরচ

করব সে-ঘরের জন্যে। তোমার একটি কথায় আমি লাখ টাকা খরচ করতে পারি—

কথা শুনে আর স্থির থাকতে পারত না বিপাশা। স্বামীকে বাধা দিয়ে দৃঢ়স্বরে বলত, না, আমার জন্যে শুধু শুধু তোমাকে এক পয়সাও খরচ করতে হবে না—

দ্রুতপায়ে সে স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে যেত।

অনেক দূরের পথ বিপাশাকে ডাকে। যেখানে দম্ভ নেই, আত্মজাহির নেই। সেখানে শুধু সমবেদনা। এই প্রাসাদ ছেড়ে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করত তার। অসিতকে সহ্য হত না। এক একবার মনে হত তাকে সংশোধন করে বুঝিয়ে দেয় যে বাইরের প্রলোভন দেখিয়ে মনের কাছে এগিয়ে আসা যায় না।

কিন্তু লজ্জা হত তার তা করতে। স্বামীর কাছে কেন সে এমন করে নিজের ছোটখাটো চাওয়া-পাওয়ার হিসেব করতে যাবে। আর একথা ভাববার সঙ্গে সঙ্গে তার নিজেকে স্বার্থপর বলে মনে হত।

না, কাউকে বলে বুঝিয়ে সে কিছুই নেবে না—তার চেয়ে যেখানে সূক্ষ্ম অনুভূতি নেই সেখান থেকে নিঃশব্দে সরে যাবে। কুটিল জগতের হাসির সঙ্গে সে কখনও তাল মেলাবে না।

গভীর রাত্রে ডেকে দাঁড়িয়ে উচ্ছল সমুদ্রের তরঙ্গলীলা দেখতে দেখতে সেসব কথা স্বপ্নের মতো মনে হয় বিপাশার। মাঝখানের কয়েকটা বছর কোথা দিয়ে কেটে গেল সে বুঝতে পারে না। ঝড়ের মতো যেন দিন চলে যায়।

এ কোন জাহাজের আলো?

অনেক দূরে জলের ওপর দুলে-দুলে উঠছে—এ কোন জাহাজ? এমন করে আলোর সঙ্কেতে কি কথা জানাতে চায় বার বার!

ডেকের রেলিঙে ভর দিয়ে ঢেউ-এর দিকে তাকিয়ে থাকে বিপাশা। জাহাজে বলে নয়—অনেক রাত অবধি জেগে থাকা তার অভ্যাস।

শুধু ঢেউ-এর গর্জন আর বাতাসের একটানা হাহাকার। হাওয়ার

প্রচণ্ড তোড়ে বয়লারের গম গম শব্দও কানে আসে না। চঞ্চল সমুদ্রকে হঠাৎ যেন আরও বিক্ষুব্ধ করে দিচ্ছে জাহাজের চাকার দ্রুত ঘূর্ণন।

ফেনার কুণ্ডলী জমা হচ্ছে মুহূর্তে-মুহূর্তে আর জলের আলোড়নে ভেঙে-ভেঙে সরে যাচ্ছে। তারপর একসময় মিলিয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের অন্ধকারে। আর ঠিক তেমনি করেই এদিকে আবার ফুলের মতো ফুটে উঠছে ফেনার পুঞ্জ।

তবু বিপাশার ক্লান্তি আসে না। রাতের নিঃসীম নির্জনতায় জাহাজের সারারাত জ্বলা আলোয় ঢেউ-এর এই ক্রীড়ারঙ্গে বিভোর হয়ে সে যেন কাটিয়ে দিতে পারে কত রাত, কত জ্যোৎস্না আর অমাবস্যার কত গম্ভীর অন্ধকার।

দারুণ আক্রোশে ফুলে ওঠা ঢেউ যেন আক্রোশের ভয়ঙ্কর দাহ নিয়ে গ্রাস করে নিতে চায় সমস্ত জাহাজ! মেকী দম্ভের এক-একটি প্রতীককে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়।

আর কখনও কখনও যেন মৃদু শান্ত ঘুমপাড়ানি দোলা দিয়ে যায়। এই দোলা আর গর্জন—সুন্দর আর ভয়ঙ্কর—সব কিছু ছাড়িয়ে কিসের সূক্ষ্ম একটা ইঙ্গিত পায় বিপাশা। খুশির চঞ্চল ঝাপটায় নিজেও যেন এই জাহাজের মতো ঢেউ-এর তালে তালে ফুলে উঠতে চায়।

অন্ধকারের জাল কেটে-কেটে উন্নতশির আলোকের রেখা বিপাশাকে কয়েক পা সামনে টেনে নিয়ে আসে। ভয়ঙ্কর অন্ধকারে মাঝ-সমুদ্রের আলোকস্তম্ভ স্থির একটা আশ্বাস সূর্যমুখী ফুলের মতো হঠাৎ ফুটিয়ে যায় তার মনে। হাওয়ায় চুল ওড়ে বিপাশার। ঘুম আসে না। রেলিঙে ভর দিয়ে মুখ নিচু করে সে একবার জলের দিকে তাকায়। একবার ডেকের অন্য প্রান্তে চোখ বুলোয়। মাথা তুলে আকাশের একটা কাঁপা-কাঁপা তারাকে লক্ষ্য করে অনেকক্ষণ। হঠাৎ জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে। তারপর পেছন ফিরে দেখে কাছাকাছি কোন চেয়ার আছে কি-না।

একটু দূরে কয়েকটা চেয়ার ক্লান্তিতে ঝিমোলেও হেঁটে-হেঁটে যেন এক পাও যেতে ইচ্ছে করে না বিপাশার। মাথার ওপর হারিয়ে-যাওয়া তারাকে সে আবার খোঁজবার চেষ্টা করে।

কিন্তু আকাশে অনেক তারা। শুধু কাঁপা-কাঁপা একটিকে কিছুতেই আর খুঁজে পায় না বিপাশা। অসিতের কথা আবার মনে পড়ে যায়।

অসিতের সঙ্গে প্রথমে কোন গোলমাল তার হয় নি। নিজের পাওনা নিয়ে বিপাশা কোনদিন কারোর সঙ্গে কলহ করে না। আজ সে ঠিক বুঝতে পারে না কেন সেদিন সে অমন করে তার নিজের সংসার ছেড়ে এসেছিল।

ব্রজকিশোর অন্য জগতের মানুষ। কারোর কোন বিষয়ে তাঁর যেন কোন কৌতূহল নেই। সাধারণ বাপের মতো মেয়ের মনের ভেতরটা তিনি যদি দেখতে পেতেন তাহলে তাকে বুঝিয়ে আবার স্বামীর ঘর করতে পাঠিয়ে দিতেন। কিন্তু এতটুকু সাংসারিক জ্ঞান তাঁর নেই। তাই বিপাশা বিলেতে পাড়ি দেবার আগের দিন পর্যন্ত তিনি বুঝতেই পারেন নি কেন সব ছেড়ে সে চলে যাচ্ছে।

মেয়ের প্রস্তাবে খুশি হয়ে তিনি বললেন, খুব ভাল কথা মা, জ্ঞানের আরাধনায় তুমি যে বিদেশে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছ একথা ভেবে আনন্দে আমার মন ভরে যাচ্ছে—আমার শিক্ষা দেয়া সার্থক হয়েছে।

অসিত কিন্তু আহত হয়েছিল। তার অমন করুণ মুখ বিপাশা আর কখনও দেখে নি। সে ভাবতে পারে নি তার স্বামী এই ব্যাপারের জন্যে অমন করে ভেঙে পড়বে।

তুমি আমাকে আগে কোন কথা বললে না কেন? আমি কি তোমাকে অযত্ন করেছি?

না না, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। আমি নিজেই জানি না কেন অত দূরে চলে যাচ্ছি—

আমিও তোমার সঙ্গে যাব ?

না না, দয়া করে তুমি আমার সঙ্গে এস না। সংসার আমার ভাল লাগল না, ভাল লাগছে না। তোমার বলে নয়, কারোর সংসারে আমি থাকতে পারব না বলেই তো সব ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

কিন্তু কেন ? কী আমার অপরাধ ?

তোমার কোন অপরাধ নেই।

তুমি কি আর ফিরে আসবে না বিপাশা ?

খুব আস্তে যেন অসিত শুনতে না পায় এমন স্বরে বিপাশা বলেছিল, বোধহয় না।

অসিত কিন্তু শুনতে পেয়েছিল। বিপাশার কাছে এসে তার হাত ধরে সে দীর্ণস্বরে বলল, কিন্তু আমি কী করব ? আমার কী হবে ?

তুমি পুরুষ, তুমি ধনী। তোমার ভাবনা কী ? কত মেয়ে সাড়া দেবে তোমার ডাকে, একটু থেমে সে বলল, তুমি আবার বিয়ে করবে—এমন কোন মেয়েকে যে তোমার সম্পদ দেখে দিশা হারাবে, তোমার অকৃপণ প্রেম পেয়ে ধন্য হবে। দয়া করে আমাকে তুমি যেতে দাও। আমিও তো তোমাকে মুক্তি দিয়ে গেলাম, কথা বলতে বলতে বিপাশার গলা ধরে এল। চোখে জল চিক চিক করে উঠল তার।

অসিত বলল, না বিপাশা, তুমি আমাকে মুক্তি দিতে পারবে না। ভয় নেই, আমি তোমার কোন কাজে কখনও বাধা দিই নি। আজও তোমার যাবার বেলায় বাধা হয়ে দাঁড়াব না। যেখানে খুশি তুমি যাও। কিন্তু আমি তোমার জন্যে সারা জীবন অপেক্ষা করব। আমি সত্যি বুঝতে পারছি না কেন তোমাকে পেয়ে হারালাম।

না না, এমন করে তুমি এসব কথা বলো না। কোন সংসারে থাকতে পারব না বলে সব ছেড়ে সকলকে ছেড়ে শুধু একা থাকবার জন্যে আমি দূরে চলে যাচ্ছি।

অসিত শুনেছিল সব কথা। উত্তেজনার উষ্ণ ছোঁয়ায় তার চোখ

দুটো অদ্ভুত বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল। প্রথম-প্রথম কোন প্রতিবাদ আসে নি তার দিক থেকে। আর তার প্রতিদিনের জীবনযাত্রার রূঢ় পরিবর্তন বিচলিত করে তুলেছিল বিপাশাকে। এমন কি, এ-পরিবেশ ছেড়ে দূরে যাওয়ার ইচ্ছেও অনেক কমে এসেছিল।

কিন্তু আস্তে আস্তে ভাবের ঘোর যেন কেটে গেল অসিতের। বিরক্তির রেখায়-রেখায় ছোট হয়ে আসত তার কপাল। সন্দেহের বিকট এক দৃষ্টি বুলিয়ে-বুলিয়ে সে যেন সারাদিন পাহারা দিত বিপাশাকে। কে আছে তার পেছনে ?

আমার কথা কেন তুমি ভাববে না বিপাশা ?

ভেবেছি বলেই তো চলে যাচ্ছি।

তার মানে ?

যেখানে আমার মন নেই—যে সমাজের বন্ধনে আমার সব চেয়ে আপনার—তাকে ঠকাব কেমন করে ?

জান, উগ্র নিষ্ঠুর অসিতের গলার স্বর, আমাকে প্রবঞ্চনা করবার জন্যে তোমাকে আমি শাস্তি দিতে পারি ?

দাও। কিন্তু প্রবঞ্চনা করতে পারলে থেকেই যেতাম—

বিপাশাকে বাধা দিয়ে অসিত চিৎকার করে উঠেছিল, আমাকে বলতেই হবে কে আছে তোমার পেছনে !

বলব।

আমি শেষ করে দেব তাকে—আমিও বুঝিয়ে দেব যে—। এক মুহূর্তের জন্যে চমকে উঠেছিল বিপাশা। ভাল করে একবার তাকিয়ে দেখেছিল অসিতের দিকে। তারপর অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসতে-হাসতে বলেছিল, অসম্ভব। আমার পেছনে যে আছে তুমি কোনদিনও তার ধরা-ছোঁয়া পাবে না—

অসম্ভবকে কেমন করে সম্ভব করে তুলতে হয়, হিংস্র ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল অসিত, আমি তোমাকে তা দেখিয়ে দেব—

দিও।

কে সে? তাঁর নাম তোমাকে বলতেই হবে।

আর একবার অসিতের দিকে তাকিয়ে বিপাশা বলেছিল, আমার পেছনে আছে এই পৃথিবী—অলৌকিক মুক্তি—

সোজা ভাষায় কথা বল।

আমি জানতাম যে আমার ভাষা তুমি কোনদিনও বুঝতে পারবে না। আর স্বার্থে আঘাত লাগলে তোমার এই বিকট রূপ বেরিয়ে পড়বেই—

বাধা দিয়ে তীক্ষ্ণ চিৎকার করেছিল অসিত, এখনও কিছুই বেরিয়ে পড়ে নি—

কী তুমি করতে চাও?

আমাকে প্রবঞ্চনা করে—বোকা বানিয়ে আমার বংশে কলঙ্কের দাগ লাগাবার কোন অধিকার তোমার নেই।

কিন্তু বাঁচবার অধিকার প্রত্যেক মানুষেরই আছে। তোমার সংসারে তিল-তিল করে আমি মরতে পারব না।

অসিতের গলা থেকে দম্ভের একটা গর্জন বেরিয়ে এসেছিল, আমি আইনের সাহায্য নিয়ে জোর করে তোমাকে আটকে রাখব—

তাহলে তুমি পাবে একটা মৃতদেহ। বরফের মতো ঠাণ্ডা—হঠাৎ ইস্পাতের মতো কঠিন হয়ে যেন অসিতকে টুকরো-টুকরো করবার জন্যে ঝলসে উঠেছিল বিপাশা, কিন্তু যে-কোন আইনের সাহায্য তুমি নিতে পার—আমাকে বেঁধে রাখতে পারবে না।

কিন্তু কেন তুমি আমাকে বিয়ে করেছিলে?

ভেবেছিলাম তোমার সংসারে আমি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারব, একটু চুপ করে থেকে বিপাশা বলেছিল, আমি পারলাম না—পারব না।

তারপর আর কী কথা বলেছিল অসিত—নিজেকে কত ছোট করে তুলেছিল বিপাশার কাছে—সেকথা তার মনে পড়ে না। শুধু

তার আস্ফালনের বীভৎস ভঙ্গিটাই মনে পড়ে। আর করুণার হাসি আজও ফুটে ওঠে তার মুখে।

শুধু অসিত কেন, দম্ভের ঢেউ-এ-ঢেউ-এ ফুলে ওঠা আজকের যে কোন মানুষ হয়তো ঠিক তেমনি করেই শাসন করতে চাইত বিপাশাকে—তেমনি করেই নিজের প্রতাপের আঁচে পুড়িয়ে মারত নিজেকেই। আর অসিতের মতো তাকে আরও দূরে সরিয়ে দিত।

প্রথম-প্রথম যখন সমবেদনার সুর ফুটে উঠেছিল অসিতের কথায় আর ব্যবহারে—বেদনায় দৃষ্টি হয়ে উঠেছিল সজল তখন বিপাশার মনেও ক্রন্দনের একটা তরঙ্গ যেন আছড়ে পড়েছিল। বিপুল এক দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিল সে।

হয়তো একথাও মনে হয়েছিল যে সে চলে গেলে একটা মানুষ একেবারে ভেঙে পড়তে পারে। যাওয়া কঠিন হত বিপাশার। ফিরে-ফিরে তাকাত। ইতস্তত করত। হয়তো মানিয়ে নেবে কি-না সেকথাও তাকে ভাবতে হত। আর কে জানে, একদিন হয়তো করুণ একটা মুখ, সমবেদনার স্থির এক আশ্বাস আর নিঝুম দেয়ালে ম্লান কাঁপা-কাঁপা একটা ছায়া তাকে অসিতের কাছেই ফিরিয়ে আনত আবার।

কিন্তু অসিত তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। কোন দায় নেই এখন বিপাশার। কোন গ্লানি—কোন অনুশোচনা নেই। অসিতের হিংস্র ভয়ঙ্কর রূপই তাকে পুরোপুরি মুক্তি দিয়েছে। একদিন যে তারা দুজন একই বাড়িতে বাস করেছে সেকথাও আজকাল বিপাশার একেবারেই মনে পড়ে না।

শেষ অবধি অসিত কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে নি যে অন্য আর এক বন্ধন গড়ে ওঠে নি বিপাশার জীবনে। এখানে-ওখানে সেই অদৃশ্য মানুষকে খুঁজে বেড়িয়ে নিজের দৈন্য প্রকাশ করেছিল বিপাশার কাছে। কিন্তু রাগ নিবে গিয়েছিল বিপাশার তখন। অসীম কৃপায় তার মন ভরে গিয়েছিল। কত অসহায় অসিত!

নির্লজ্জের মতো ব্রজকিশোরবাবুর কানেও সে তুলেছিল একথা।

তার জীবন নষ্ট করে দেয়ার কোন অধিকার যে বিপাশার নেই—সেকথাও বলেছিল তাঁকে। বিপাশা লক্ষ্য করেছিল তার বাবার চেহারা অসিতের কথা শুনে হঠাৎ আশ্চর্য রকম কঠিন হয়ে উঠেছিল আর তারপরই মুখে ফুটে উঠেছিল একটা দিশাহারা ভাব।

মা, ভিজে ভারী স্বরে তিনি বলেছিলেন বিপাশাকে, কোন মানুষকে সজ্ঞানে দুঃখ দিতে নেই।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করেছিল বিপাশা। লজ্জার কম্পনে স্থির হয়ে ছিল। তারপর মুখ নামিয়ে আস্তে আস্তে বলেছিল, ও নিজেই দুঃখ পাচ্ছে বাবা—আমি কেন দুঃখ দিতে যাব?

তুই নাকি ওকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে চাস না?

না, সব সঙ্কোচ ততক্ষণে কেটে গিয়েছিল বিপাশার, ওর উপস্থিতি আমি সহ্য করতে পারি না।

চমকে উঠেছিলেন ব্রজকিশোরবাবু। বিপাশার কাছে এসে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন অনেকক্ষণ। একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দও যেন শুনতে পেয়েছিল বিপাশা। কিন্তু বুক থেকে তার যেন একটা ভারী বোঝা নেমে গিয়েছিল। ভালই করেছে অসিত। দশজনের সমবেদনা ভিক্ষা করতে গিয়ে সব কিছু প্রকাশ করে বিপাশার সঙ্কোচ একেবারে ঘুচিয়ে দিয়েছে। তাই বাবার সামনে মাথা তুলে নিজেকে প্রকাশ করতে তার আর কোন লজ্জা নেই।

কিন্তু অকারণে তুই তাকে দুঃখ দিবি কেন?

মিথ্যা কথা বাবা। ওর কোন দুঃখ নেই।

থেমে থেমে ব্রজকিশোরবাবু বলেছিলেন, এখনও ভেবে দেখ। বয়সের ঝাঁজে হঠাৎ কিছু করতে নেই।

বিপাশা ভেঙে পড়েছিল ব্রজকিশোরবাবুর কোলের ওপর, কেন তুমি আমাকে এ-বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলে বাবা?

তিনি ম্লান হেসেছিলেন, না না, তাড়িয়ে দেব কেন, আমি যখন থাকব না তখন—

ও-কথা বলো না।

তারপর বাপ আর মেয়ের মধ্যে আর কোন কথা হয় নি। দেশ ছেড়ে যাবার আগে-আগে ব্রজকিশোরবাবুর বাড়িতেই এসে উঠেছিল বিপাশা। সব ব্যাপারটাকে সহজ করে তোলবার জন্যে তাঁর সঙ্গে এলোমেলো কথা বলে বিপাশা ঠিক আগেকার মতোই ঘুরে বেড়াত এ-ঘর থেকে ও-ঘর।

কিন্তু সহজ হয়ে উঠতে পারেন নি ব্রজকিশোরবাবু।

থেকে থেকে জাহাজের বাঁশি বাজে। নিঃশব্দে রাত বেড়ে যায়। কিন্তু এ-রাতও শেষ হবে। দুধ-সায়রের অতল থেকে আস্তে আস্তে নিজেকে ফোটাবে সূর্য। তারপর হঠাৎ এক সময় জলের চেয়ে অনেক ওপরে উঠে যাবে।

মাথার ওপর অনেক তারা-জ্বলা আকাশ। নিচে সমুদ্র। জল আর আকাশের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্যে ভয় পায় বিপাশা। যেন একটা ভয়ঙ্কর প্রলয় হচ্ছে কোথাও। কাড়াকাড়ি ও প্রচণ্ড কোলাহল। সুধা আর বিষ। কৌস্তভ আর উচ্চৈঃশ্রবা। অপ্সরা আর—

শক্ত করে ডেকের রেলিঙ চেপে ধরে বিপাশা। স্থির চোখে অবাধ সমুদ্রের চঞ্চলতা অনুভব করে। জাহাজের ধূম হাওয়া কেটে-কেটে ওপরে ওঠে। বয়লারের গমগম শব্দ আরও জোর হয়ে ওঠে। আরও ঘন ঘন বাজে জাহাজের বাঁশি।

হাওয়ায় চুল ওড়ে বিপাশার। শাড়ি কাঁপে। ক্লান্তির দুঃসহ একটা দাহ যেন অল্প-অল্প যন্ত্রণা দেয়। বেঁচে থাকার গ্লানি হঠাৎ প্রবল হয়ে ওঠে। নিজের বেঁচে থাকবার মুক্ত স্বাধীন একটা জায়গা কেমন করে খুঁজে পাবে সে—কেমন করে গড়ে নেবে!

কিন্তু কেন সে গিয়েছিল বিদেশে? কিসের আশায়? পৃথিবীর সর্বত্রই একদিকে সুধা আর একদিকে বিষ। বণ্টনের চাতুরী কেবলই বঞ্চনার রঙে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে মানুষের। বিপাশা হঠাৎ হয়তো পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের জন্যে নিবিড় বেদনা অনুভব করে।

তখনও সমুদ্রের জলে আলোর ছায়া কাঁপছে!

নিঃসন্দেহে এই ক-বছর বিদেশে কাটিয়ে বিপাশা অনেক জেনেছে, অনেক বুঝেছে, বহু ভুল ধারণা ভেঙে গেছে তার। কিন্তু এই জাহাজে না ফিরলে হয়তো সব কিছু অসম্পূর্ণ থেকে যেত। জীবনকে যাচাই করে নেবার সুযোগ পেয়েছে সে!

সুরমা ঘোষালের কথা ভেবে তার দুঃখ হয়। সব বোঝে সে। সুরমার সঙ্গে অবনী ঘোষালের কর্কশ ব্যবহার তার বিসদৃশ লাগে। তবু দেখা হলেই সুরমা স্বামীর গুণ গায়। অমন মানুষ নাকি হয় না। সুরমার বহু সৌভাগ্য অবনী ঘোষালের মতো স্বামী পেয়েছে।

জানেন, দেখা হলে আপন মনে যেন সুরমা বলে যায়, এক মুহূর্ত উনি আমাকে চোখের আড়াল করতে চান না। তাই মাঝে মাঝে বিরক্তি লাগে আমার—

কিছু একটা না বলা ভাল দেখায় না তাই বিপাশা হেসে বলে, বাঃ, অমন স্বামী কজন পায়!

সত্যি, বিপাশার কাছে সরে এসে সুরমা বলে, স্বামীর সঙ্গে বিলেত বেড়িয়ে যাওয়া তো সহজ ব্যাপার নয়—

তা তো নয়ই, সুরমার কথায় সায় দিয়ে বিপাশা বলে, দুজনে খুব বেড়ালেন তো?

হ্যাঁ, খুব বেড়িয়েছি, কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে সুরমা তারপর বলে, ও দেশটা কিন্তু জানেন, আমার খুব ভাল লাগে নি—

কেন বলুন তো?

ওরা বড় বেশি স্বার্থপর। আর অন্যের জন্যে ওদের প্রাণের টানটাও যেন বড় কম। ধরুন, যে-স্বামী-স্ত্রী বছরের পর বছর ঘর করল—হঠাৎ একদিন তারা সব চুরমার করে আলাদা হয়ে গেল।

পরস্পরকে ঠকিয়ে চিরকাল অশান্তির মাঝে বাস করার চেয়ে মিথ্যা সম্পর্ক ভেঙে দেয়াই তো ভাল—

দৃঢ়স্বরে সুরমা বলে, না। ভাল নয়। আমরা হলে কি ভাঙতে পারতাম!

উপায় থাকলে ভাঙতেন বইকি—

চমকে উঠে সুরমা বলে, কিসের উপায়?

যদি আপনি বুঝতেন যে সম্পর্ক ভেঙে বেরিয়ে এলে বেঁচে থাকবার কোন অসুবিধা হবে না তাহলে মনে মনে চিরদিন এত বড় মিথ্যাকে আপনি কি শ্রদ্ধা করতে পারতেন?

এদিক-ওদিক তাকিয়ে সুরমা চাপা স্বরে বলে, না।

সকলের বেলায় তাই, হঠাৎ একটা নিশ্বাস ফেলে বিপাশা, তবে কি জানেন, সত্যি-মিথ্যা যাচাই করা বড় কঠিন—

কিন্তু তাকে বাধা দিয়ে সুরমা হঠাৎ ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করে, আপনি তো সব সম্পর্ক ভেঙে দিয়েছেন না?

হাসে বিপাশা। সে-খবরও কারুর জানতে বাকি নেই। সে দু-এক মিনিট চুপ করে থেকে বলে, আপনি জানলেন কেমন করে?

উনি বলছিলেন—

আপনার স্বামী?

হ্যাঁ।

অদ্ভুত হাসি খেলে বিপাশার ঠোঁটের ফাঁকে, কি বলেছেন উনি আমার কথা আপনাকে?

বিপাশার প্রশ্নের কি উত্তর দেবে সুরমা হঠাৎ ঠিক করতে পারে না বলেই ইতস্তত করে। চটপট একটা মিথ্যার জাল বুনে তুলতে পারে না মনে মনে। তাই সে চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ।

যদি না বলতে চান—বলবেন না, যেন সুরমার সঙ্গে রহস্য করবার জন্যেই বিপাশা বলে, কিন্তু আমি জানি উনি আমার কথা কি বলেছেন আপনাকে—

তখন মাথা তুলে সুরমা প্রশ্ন করে, কি?

উনি আমার নিন্দে করেছেন।

না না—

বাধা দিয়ে বিপাশা থামিয়ে দেয় সুরমাকে, এই সামান্য ব্যাপারের জন্যে কেন আপনি লজ্জা পাচ্ছেন? সুরমার পুতুলের মতো নির্বাক দেহটা ঝাঁকিয়ে দিতে ইচ্ছে করে তার, যদি আপনি আপনার স্বামীর স্বার্থে আঘাত দেন তাহলে উনি সঙ্গে সঙ্গে আপনারও নিন্দে করবেন— দূরের একটা ফুলে-ওঠা ঢেউ-এর দিকে তাকিয়ে কি ভেবে বিপাশা বলে, একটু আগে আপনি বলছিলেন না ওদের মানুষ স্বার্থপর?

যেন লজ্জার অস্ফুট একটা ধ্বনি বার হয় সুরমার গলা থেকে, হ্যাঁ।

শুধু ওদেশের নয়, আকাশের সব চেয়ে উজ্জ্বল তারার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বিপাশা বলে, আজকের সব মানুষই বোধহয় স্বার্থপর। নিজের ইচ্ছের একচুল এদিক-ওদিক হলেই—

ঠিক বলেছেন, বিপাশাকে দৃঢ় একটা অবলম্বনের মতোই মনে করে সুরমা, কিন্তু আপনি কেন—ইতস্তত করে সে।

সম্পর্ক চুকিয়ে দিলাম? এই তো?

হ্যাঁ। কারণ এই অল্প কদিন আপনাকে দেখেই আমি বুঝেছি যে নিন্দে করবার কিছু নেই আপনার—

তবুও তো আপনার স্বামী আমার নিন্দে করেন—

না না, আবার প্রতিবাদ জানায় সুরমা, হয়তো এই জাহাজেরই কেউ ওকে কিছু বলেছে। না হলে উনি শুধু শুধু আপনার নিন্দে করতে যাবেন কেন আমার কাছে!

আপনি লজ্জা পাবেন না, কপালের ওপর উড়ে-পড়া একটা কাঁপা-কাঁপা চুল এক হাতে সরিয়ে দিয়ে বিপাশা বলে, নিন্দে কিম্বা প্রশংসা—দুটোর কোনটা নিয়ে আমি একটুও ব্যস্ত হই না—

অবনী ঘোষাল এদিক-ওদিক কোথাও আছে কিনা ভয়ে-ভয়ে একবার দেখে নেয় সুরমা। না থাকলেও এখন এখান থেকে তার সরে যাওয়া দরকার। বিপাশার সঙ্গে কথা বলতে দেখলে হয়তো সে তাকে আবার একটা কঠিন ধমক দেবে।

উনি আমাকে বেশিক্ষণ না দেখলে অস্থির হয়ে পড়েন, হঠাৎ বলে ওঠে সুরমা, আমি এখন যাই—পরে সব কথা শুনব আপনার—

বিপাশা শুধু মাথা নাড়ে।

সুরমার কথা শুনে মনে মনে সে হাসে। গত কাল রাত্রে একটা মজার ঘটনা ঘটে গেছে। সেকথা মনে পড়ে তার। আর সেই কারণেই বিপাশা হাসে।

কাল অভ্যাস মতো বিপাশা ডেকে দাঁড়িয়ে ছিল। এর আগেও সে লক্ষ্য করেছে দূর থেকে অনেকক্ষণ কে যেন তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। বিপাশা বুঝতে পারে সে অবনী ঘোষাল।

দূর থেকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় আস্তে আস্তে অবনী ঘোষাল বিপাশার কাছে এগিয়ে এল। আর কেউ কাছাকাছি নেই। সুরমা বোধ হয় কেবিনে গিয়ে শুয়ে পড়েছে।

হেসে অবনী ঘোষাল বলল, অনেক রাত অবধি জেগে থাকা বুঝি আপনার অভ্যাস?

হ্যাঁ, আপনিও তো জেগে থাকেন দেখি।

বিপাশাকে কী ভেবেছে অবনী ঘোষাল সে জানে না। না হলে হঠাৎ এমন কথা সে বলে কেমন করে!

অবনী বলল, দূর থেকে রোজ আপনাকে দেখতে ভাল লাগে তাই আজ সাহস করে কাছ থেকে দেখতে এসেছি।

সুরমা কোথায়?

কে জানে, ওকে আমার ভাল লাগে না। ভাল লাগলে কি আর ওকে ফেলে আপনাকে দেখতে আসি?

গম্ভীর হয়ে অবনী ঘোষালের মুখের দিকে তাকিয়ে বিপাশা বলল, না দেখলেই ভাল করতেন।

কেন বলুন তো? আপনার আপত্তি আছে নাকি?

হ্যাঁ, বিপাশা বলল, দূর থেকে যে যাকে খুশি দেখতে পারে।

তাতে কারোর কিছু বলবার নেই। কিন্তু কাছে এসে আর একজনের শান্তি ভঙ্গ করলে—শান্তির ব্যাঘাত কেউই পছন্দ করে না।

কিন্তু আমার যদি আপনাকে ভাল লাগে?

সে-কথা নিজের স্ত্রীর সামনে আমাকে বললেই তো পারতেন।

কোন মেয়ের মুখ থেকে এমন ধরনের কথা অবনী ঘোষাল বোধ হয় জীবনে শোনে নি। আর কিছু না বলে সে আস্তে আস্তে সেখান থেকে সরে গেল। দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে আর বিপাশাকে দেখবার চেষ্টা করল না। হতাশ হয়ে অপমানের জ্বালায় বোধ হয় কেবিনে সুরমার পাশেই ফিরে গেল।

হেসে উঠতে ইচ্ছে করল বিপাশার। এমন লোকের কথা সে অনেক শুনেছে। সে জানে সুরমাকে অবনী ঘোষাল বলবে বিপাশার চরিত্র ভাল নয়, তার সঙ্গে গায়ে পড়ে রসিকতা করতে এসেছিল ইত্যাদি।

আর মুখ বুজে সুরমা তাই শুনবে। তাই বিশ্বাস করবে। বেচারি নিজের সৌভাগ্যের নির্বুদ্ধিতায় কোনদিন এই প্রবঞ্চনার কথা জানতে পারবে না।

অন্যের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করা কিম্বা অকারণে কাউকে কোন উপদেশ দেয়া বিপাশার স্বভাব নয়। ট্যুরিস্ট ক্লাসের প্যাসেঞ্জার জান্নুর সঙ্গে আর পাঁচজনের কৌতূহলী দৃষ্টি আকর্ষণ করে মনীষার অত বাড়াবাড়ি তার ভাল লাগে নি।

তবু তাকে সে কোনদিন কিছু বলে নি কারণ এ হলো ওদের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। কে জানে হয়তো মনীষা জান্নুর মধ্যে এমন কিছু দেখতে পেয়েছে যা এর আগে আর কোন লেখাপড়া জানা ভদ্রলোকের মধ্যে পায় নি, তাই সব কিছু অগ্রাহ্য করে ওর সঙ্গে প্রাণখুলে মিশছে—সব কিছু তুচ্ছ করে ওর তালে তাল মেলাচ্ছে।

কিন্তু দু-একদিন হল মনীষা আর ট্যুরিস্ট ক্লাসের দিকে পা বাড়ায়

না। বিপাশা লক্ষ্য করে জান্নু ডাকতে এলে সে তাকে কৌশলে এড়িয়ে যায়।

কৌতূহল দমন করতে পারল না বিপাশা। যা তার একেবারে স্বভাব বিরুদ্ধ অকস্মাৎ সে তাই করে বসল।

অর্থাৎ মনীষার কাছে এসে তাকে কোন ভূমিকা না করে প্রশ্ন করল, কী ব্যাপার মনীষা? ভাব হতে না হতেই ঝগড়া বাধিয়ে বসে আছ বুঝি?

কিছু বুঝতে না পেরে মনীষা বলল, কী বলছ বিপাশাদি? তোমার কথা বুঝতে পারছি না।

ট্যুরিস্ট ক্লাসের দিকে আর যাও না, বন্ধু খবর নিতে এলে তাকে কঠিন স্বরে ফিরিয়ে দাও—

হেসে বিপাশাকে বাধা দিয়ে মনীষা বলল, তুমি কী বিপাশাদি। পাগলের মতো যাতা বকছ। ও লোকটা আমার বন্ধু হতে যাবে কেন?

জানি, আহত দৃষ্টিতে মনীষার দিকে তাকিয়ে বিপাশা বলল, কিন্তু তোমার মুখ থেকে যে এমন কথা শুনব তা আমি ভাবতে পারি নি।

বিচলিত হয়ে মনীষা বলল, বা রে, আমি আবার কখন কী বললাম?

বিপাশা বলল, আমি ভেবেছিলাম জান্নুর সঙ্গে তোমার বুঝি সত্যি—

ছি ছি, আমাকে এত ছোটো তুমি ভাবতে পারলে কেমন করে?

তাহলে তোমাকে অনেক বড় ভাবতাম মনীষা। আজ কিন্তু তোমাকে আমার ছোটো মনে হচ্ছে।

মনীষা হেসে জিজ্ঞেস করল, কেন?

বিপাশা একবার ভাবল চুপ করে যায়। পরের এসব কথায় থাকবার দরকার কি তার! কিন্তু তার সে ইচ্ছে বোধহয় এক মুহূর্তের। নিজেকে দমন করতে পারল না বিপাশা।

আজকাল এমনি হয়। চারপাশে তাকিয়ে হয়তো হঠাৎ এক

জায়গায় সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। যেখানে কোন কথা বলবার কোন অধিকার তার নেই—সেখানে যদি সামান্য অন্যায় ঘটবার সম্ভাবনা থাকে কিম্বা ঘটে তাহলে সে মুখ খুলবেই।

প্রথম-প্রথম এমন ইচ্ছে হত না বিপাশার। নিজে ঠকছে বুঝতে পারলে কোন কথা না বলে সেখান থেকে সে নিঃশব্দে সরে যেত। অন্যায় সহ্য করতে না পারলেও মাথা তুলে সমস্ত শরীর দিয়ে বিদ্রোহ করে তা বন্ধ করবার চেষ্টা করত না।

কিন্তু এখন সে মুখ বুজে সরে যেতে পারে না। বিদ্রোহ করে। প্রতিবাদ জানায়। আগুনের একটা জ্বলন্ত পিণ্ড যেন পাকিয়ে-পাকিয়ে ওঠে তার মনের মধ্যে। নিজে পোড়ে না বিপাশা কিন্তু সে-আগুন অন্যায়কারীর মুখে ছুঁড়ে মারবার একটা তীব্র ইচ্ছে তাকে ঘুমহীন করে তোলে।

একটা লোককে, ঝাঁজের একটা কড়া রঙ যেন ঝলসে উঠল বিপাশার চোখে-মুখে, যাকে তুমি সব দিক থেকে অনেক নিচু মনে কর—কেন তার সঙ্গে এ-বঞ্চনার খেলা খেলতে গেলে?

হাসি হঠাৎ নিবে গেল মনীষার, খেলা তো খেলাই—

কিন্তু একটা জীবন নিয়ে খেলা করবার তোমার কোন অধিকার নেই—

ধমক খেয়ে মনীষার স্বরও একটু যেন রূঢ় হয়ে উঠল, তুমি কখনও খেলা কর নি?

না। জীবন নিয়ে আমি কখনও খেলা করি নি।

কিন্তু বিপাশাদি, মনীষা সহজ হবার চেষ্টা করে বলল, ছোট একটা ব্যাপার নিয়ে তুমি এত উত্তেজিত হচ্ছ কেন?

তোমাকে ভালবাসি বলে, মনীষার মুখের দিকে সোজাসুজি তাকাল বিপাশা, একটা স্বাধীন দেশে এতদিন তুমি কাটিয়ে এলে—তাই জাম্মুর সঙ্গে যখন তোমার অন্তরঙ্গতার কথা তুলে এ-জাহাজের প্রত্যেকে তোমাকে বিদ্রূপ করল—

এরা আমার কে ? মাথা ঝাঁকিয়ে মনীষা বলল, এদের আমি গ্রাহ্য করতে যাব কেন ?

আমি তোমাকে তাদের কথা বলছি না মনীষা—আমিও তাদের কটাক্ষ অগ্রাহ্য করেছি। কারণ তোমার ওপর আমার অন্যরকম ধারণা ছিল—

মনীষা হেসে জিজ্ঞেস করল, কী ধারণা ?

ভেবেছিলাম তুমি যা সত্য বলে স্বীকার কর—সকলকে অগ্রাহ্য করে তা মেনে নেবেই—

সত্যি-মিথ্যা ভাববার সময় পেলাম কোথায়! তোমাকে তো আগেই বলেছি ও-দেশে এতদিন থেকে আমি সব জড়তা কাটিয়ে ফেলেছি—

বাধা দিয়ে বিপাশা বলল, না। তুমি শুধু একটা সুলভ বিলাসে গা ঢেলে সুলভ আনন্দে মেতে উঠেছ।

তুমি বড় সিরিয়াস বিপাশাদি, জীবনে 'ফানে'র স্থান দাও না, বৃথাই বিলেত বেড়িয়ে এলে! আর আমি ? দেখ তো জীবনকে কত সহজ ভাবে নিয়েছি। সারা জাহাজ জান্নুর সঙ্গে খেলা করে কাটালাম, এখন দেশের কাছে এগিয়ে আসছি বলে সতর্ক হয়ে জাল গুটিয়ে সিরিয়াস হলাম। মাঝে মাঝে একটু হালকা না হলে জীবনকে তোমার একেবারে যন্ত্রের মতো মনে হয় না বিপাশাদি ? কী বল ?

বিপাশা আর উত্তর দিল না।

ওদিকে সমর আর অলগা। তবু সমরকে ভাল লাগে বিপাশার। মনীষার মতো স্বার্থপর মনে হয় না তাকে। বিপাশা সমরকে কখনও কিছু জিজ্ঞেস করে নি। কিন্তু সমর প্রায়ই তার সঙ্গে নিজের মনের কথা বলে। আজও সমর এসে বিপাশার পাশে দাঁড়াল।

বিপাশা তাকে আসতে দেখে বলল, কি সমর ? আজকের খবর কি ? তোমাকে আজ সারাদিন দেখি নি যে ?

এই যে, ম্লান হেসে সমর বলল, আপনাকেই খুঁজছিলাম—

কেন বল তো ?

না কোন বিশেষ দরকারের জন্যে নয়, আপনার সঙ্গে কথা বলতে খুব ভাল লাগে কিনা তাই—

আমিও তোমার সঙ্গে মন খুলে গল্প করি সমর।

যদিও একেবারে প্রথমে বিপাশাকে কেন খুঁজছে সেকথা বলতে ইতস্তত করল সমর তবু সে জানে একটু পরে কী কথা বলবে সে। অলগার কথা ছাড়া তার সঙ্গে প্রাণ খুলে অন্য কোন বিষয়ের আলোচনা করে না সে।

সমরকে ভাল লাগে বিপাশার। ভাবপ্রবণ ছেলে। তাই পদে পদে ঠকে মরে। সারা জীবন হয়তো এমনি করেই শুধু পরের দুঃখের কথা ভেবে ওর কেটে যাবে। আর অন্য কারুর দুঃখ ঘোচাবার জন্যে কিছু না করতে পারার জ্বালায় জ্বলবে দিনরাত।

আজ বিপাশা নিজেই কথা তুলল, অমন করুণ মুখে কী ভাবছ সমর ? অলগার কথা তো ?

হ্যাঁ বিপাশাদি, কাল থেকে একটু বেশি করেই ভাবছি।

কী ভাবছ অত ?

বম্বে এসে গেল, আর তো মোটে কয়েকটা দিন তারপর আর ওর খবর নিতে পারব না।

কেন ? ইচ্ছে থাকলেই তো খবর নেয়া যায় ?

ওর ব্যাপারে বোধ হয় যায় না। জাহাজে-জাহাজে ঘুরবে ও এখন। আমাকে কবে খবর দিতে পারবে তাও ঠিক করে বলতে পারে না।

বিপাশা হাসল, তুমিই বা ওর খবর নেবার জন্যে এত ব্যস্ত কেন সমর ? জাহাজের ফুল জাহাজেই ঝরে যাক না। খবর নিয়ে করবেই বা কী ?

আমি সব বুঝি, বিপাশার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে সমর বলল,

সব কথা আপনাকে বোঝাবার ক্ষমতা আমার নেই। অলগা এই চাকরি শুধু নিজের জন্যে নেয় নি—তার মুখ চেয়ে বসে আছে তার বাড়ির আরও অনেক লোক। আমি ভাল চাকরি নিয়ে দেশে ফিরে যাচ্ছি। আমি সুখে দিন কাটাব। কিন্তু অলগা? দু-এক মিনিট চুপ করে থেকে সমর বলল, ওর কোন ভবিষ্যৎ নেই। এমনি দুঃখ বুকে নিয়ে ছন্নছাড়ার মতো সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে ও একদিন শেষ নিশ্বাস ফেলবে। ওকে আমার ভাল লেগেছে কিন্তু এই ভেবে দুঃখ হচ্ছে যে ওর জন্যে কিছু করবার আমার ক্ষমতা নেই—

বিপাশা বলল, এমন করে এক অলগার কথা ভেবে মন খারাপ করো না সমর—

কেন এমন হয় বিপাশাদি?

সেটা তোমার আমার দোষ নয়। লেখাপড়া শিখে তুমি এমন ভাবপ্রবণ হয়ে ওঠো কেমন করে? বুঝতে পার না সমাজ ব্যবস্থার দোষে লক্ষ অলগা ওমনি ঘরছাড়ার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। তুমি একা ঘরে বসে শুধু মন খারাপ করতে পার কিন্তু আর কিছু করতে পার না।

কেন পারি না?

তোমার মতো ভাবনা পৃথিবীর সব লোক ভাববে যেদিন এক কথায় অলগার মুক্তি আসবে। আজ সেকথা ভাল করে তাকে বুঝিয়ে বিদায় নেওয়া ছাড়া তোমার আর কিছু করবার নেই।

আমি যে অসহায় এ-কথাটা ভাবব কেমন করে!

সমরের মুখের দিকে তাকিয়ে বিপাশা হাসল। অল্প বয়স। হয়তো বড় লোকের ছেলে। বেদনাবোধ আছে। কিন্তু সাহস নেই। এই মুহূর্তে অলগাকে মুক্তি দেয়ার কল্পনায় ছটফট করছে। কিন্তু মোহ ভেঙে যেতে দেরি হবে না সমরের।

দেশে ফিরে বাপের সুপারিশে বড় একটা চাকরি নিয়ে যখন সে জাঁকিয়ে বসবে তখন হয়তো অলগার কথা ভেবে তার নিজেরই হাসি পাবে। যে-করুণা আজ তার মধ্যে নিবিড় এক বেদনাবোধের মাধুরী

রচনা করছে তা সমুদ্রের বুদ্‌বুদের মতোই মেকী জীবনের ঠুনকো আড়ম্বরের ছটায় কেটে-কেটে মিলিয়ে যাবে।

তবু বলল বিপাশা, নিজেকে অসহায় বলে যদি সত্যি তোমার মনে হয় সমর তাহলে তুমি নিশ্চয়ই সে-অবস্থাটা কাটিয়ে উঠতে চাইবে—

হ্যাঁ, আমি কাটিয়ে উঠতে চাই।

কিন্তু মনের এ-অবস্থা কতদিন থাকে তা এই সমুদ্রের বুকে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তুমি বুঝতে পার না সমর—

কিন্তু যখন বুঝব তখন অলগা কোথায় থাকবে সে-খবর যে আমি পাব না বিপাশাদি।

আবার হাসল বিপাশা, বেশ তুমি দেশে ফিরে যাও। যদি সেখানে গিয়েও অলগার ওপর তোমার মনোভাব এমনি থাকে তাহলে আমি তার খবর তোমাকে এনে দেব। আমি বম্বে পৌঁছবার আগেই অলগার সঙ্গে কথা বলে তার সব ঠিকানা জেনে রাখব—বুঝলে?

সমর চুপ করে রইল। বিপাশার কথার কোন উত্তর দিল না। একটু পরে বিপাশা আবার বলল, তোমার তাকে ভাল লেগেছে, হয়তো তুমি তাকে ভালবেসেছ, তাই শুধু তার কথা তুমি ভাবছ। কিন্তু শুধু হৃদয় দিয়ে নয়, বুদ্ধি দিয়েও যেদিন তুমি অলগার কথা ভাবতে পারবে সেদিন তোমার ওর জন্যে এত দুঃখ হবে না, ওর মতো সকলের দুঃখ ঘোচাবার জন্যে তুমি নিজে থেকেই ব্যাপক কর্মী হয়ে উঠবে।

বিপাশার মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে সমর বলল, আপনাদের কথা শুনতে আমার খুব ভাল লেগেছে বিপাশাদি।—

বিপাশা বলল, এসব কথা বুঝতে আমার অনেক সময় লেগেছে সমর। নিজের কথা কাউকে কখনও বলি নি—বলতে ইচ্ছে করে নি। তুমি আজ যেমন শুধু একজনের কথা ভেবে দুঃখ পাচ্ছ—আমিও তেমনি একদিন দুঃখ পেতাম। কিন্তু তখন বুঝি নি শুধু পরের দুঃখ দেখে কাঁদলেই তার দুঃখ দূর হয় না—কিম্বা একজনের কাছ থেকে ঠকে পালিয়ে গেলেই প্রবঞ্চনার হাত এড়ানো যায় না। আমাদের সকলকে

হাজার দুঃখ কষ্টের মাঝে থেকে সব সহ্য করে হাসি মুখে চলতি ধারা প্রবর্তনের চেষ্টা করতে হবে, সমুদ্রের দিকে মাথা নিচু করে তাকিয়ে থেকে খুব আস্তে বিপাশা বলল, তাই তো ফিরে যাচ্ছি।

ফিরে গিয়ে আপনার সঙ্গে আমি দেখা করব।

নিশ্চয়ই করবে।

আর কারোর যেন কোন কথা বলবার নেই। দুজনে মনে মনে কী যেন ভাবছে। সমর ভাবছিল অলগাকে কী কথা বলবে আর বিপাশা ভাবছিল, না শুধু বিষ নয় একদিন সমুদ্রমন্থনে কৌস্তুভ মণিও উঠেছিল। না হলে সমরের মতো এমন ছেলের দেখা পাওয়া যাবে কেন! বিষ আর অমৃত—আজকের সমুদ্রমন্থনে দুই-ই উঠছে। শুধু নীলকণ্ঠকে মন্থন-গণ্ডিতে নামিয়ে আনতে হবে। নারদ নেই আজ, কিন্তু বিপুল প্রাণশক্তি নিয়ে আছে অধীর জনতা। হয়তো তাদের কণ্ঠও নীল হয়ে যাবে। তবু তারা নিঃশেষে শেষ করে দেবে আজকের সমুদ্রমন্থনে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়া হলাহল।

রোজ সকালে কেবিনের দরজায় শব্দ হয়, ঠক ঠক ঠক। আর কারোর ঘুম ভাঙুক বা না ভাঙুক গেইল সাড়া দিয়ে বলে, যাচ্ছি রজার্স।

তারপর ও খুব তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে বেরিয়ে যায়। বিপাশা ওর দিকে তাকিয়ে হাসে। তারপর সারাদিনের মধ্যে আর ওদের দেখা হয় না। দেখা হলেও কথা হয় না, গেইল রজার্সকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে। আর কারোর দিকে মন দেবার সময় পায় না।

সেদিনও যথারীতি কেবিনের দরজায় শব্দ হল, ঠক ঠক ঠক। বিপাশার ঘুম আগেই ভেঙে গিয়েছিল, অভ্যাস মতো সে গেইলের কণ্ঠস্বর শোনবার জন্যে অপেক্ষা করছিল। আজ কিন্তু শুনতে পেল না। ওদিকে রজার্স আরও দু-একবার শব্দ করল।

গেইল, বিপাশা একটু জোরে ডাকল, গেইল—

আঃ—ইশারায় গেইল বলল, চুপ কর। আই অ্যাম্ ফেড আপ উইথ্ হিম্!

কী হল আজ তোমার?

হবে আবার কী? গেইল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, খেলা ফুরিয়ে গেল। এখন স্বামীর দেখা পাবার জন্যে অপেক্ষা করছি। আমার স্বামী বড় কড়া লোক, এসব কথা কানে গেলে আমার মুখ দেখবে না জান?

ওদিকে আর ঠক ঠক শব্দ শোনা যাচ্ছে না। গেইলের ঘুম ভাঙে নি মনে করে রজার্স বোধ হয় চলে গেছে। গেইলের সঙ্গে সঙ্গে বিপাশাও উঠে পড়ল।

বুড়ো লোকগুলো এত বোকা হয়, এখন আমার ঠিকানা নিয়ে বাড়ি যেতে চায়। কী করি বল তো ওকে নিয়ে আমি? আমার স্বামী টের পেলে—

স্বামীকে লুকিয়ে তাহলে ওর সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা করলে কেন?

গেইল হেসে বলল, অমন করা আমার ছেলে বয়সের অভ্যাস। রূপ যাদের থাকে তারা অমন করেই থাকে। আমার স্বামী কি আর বম্বেতে সাধু হয়ে বসে আছে মনে কর? ও যেমন আমাকে সব কথা লুকিয়ে যায় আমিও তেমন ওর কাছে অনেক কিছুই গোপন করি—

কেবিনে আলো জ্বেলে সাজতে সাজতে গেইল বিপাশাকে নিজের অনেক কথা বলে যায়—ব্যাখ্যা করে বোঝাতে চায় তার জীবন দর্শন। অর্থাৎ সুযোগ পেলেই সাধ্য মতো জীবন উপভোগ করবে। যে করবে না সে মূর্খ।

বুঝলে? গেইল বলে যায়, কতদিন আর আছি এ-পৃথিবীতে! একটা নিশ্বাস ছেড়ে সে তাকায় বিপাশার দিকে, একই ঘরে বসে শুধু একজন মানুষকে দেখে ফুরিয়ে যাবার ইচ্ছে আমার নেই—

বিপাশা হেসে বলল, কিন্তু জাহাজে তো শুধু একজন মানুষকেই দেখলে গেইল?

বুড়ো আর অন্য কাউকে দেখতে দিল কোথায়? নাচের চকিত একটা ভঙ্গি করে গেইল বলল, সেই কারণেই ওর ওপর আমার রাগ হয়ে গেছে হঠাৎ—আর, একটু থেমে সে বলল, আমার স্বামীকে আমি সহ্য করতে পারি না সেই কারণেই—

তাহলে কষ্ট করে যাচ্ছ কেন তার কাছে?

কেন যাচ্ছি? প্রশ্ন শুনে গেইল হঠাৎ যেন একটু থমকে গেল। মনে মনে একটা উত্তর হাতড়ে পেল না। তারপর ভেবে-ভেবে বলল বিপাশাকে, অনেকদিন তার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। তাই কিছুদিন হয়তো তাকে মন্দ লাগবে না। আর যখন অসহ্য মনে হবে তখন আবার দেশে ফিরে যাব—

যাক, মনে মনে তুমি তাহলে ছক কেটেই রেখেছ!

নিশ্চয়ই। ছক কাটা জীবনের কোন নিয়ম মানতে পারব না বলে আমি আগে থেকেই সব কিছু ঠিক করে রাখি—

স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক আইনের সাহায্য নিয়ে একেবারে চুকিয়ে দিলেই তো পার—রসিকতার হালকা সুরে কথা বলল বিপাশা।

দু-একবার যে আমার সে-ইচ্ছে না হয়েছিল তা নয়। তবে ওসব আইনগত বিচ্ছেদ আমার মা-বাবা সমর্থন করে না। আর আমার স্বামীও চায় না, জোরে হেসে উঠে গেইল বলল, তার যদিও না চাইবার অনেক কারণ আছে—

কি?

কেন? আমার রূপ তোমার চোখে পড়ে না?

পড়ে বইকি গেইল।

তবে? এমন মেয়ের সঙ্গে বিচ্ছেদের মামলা একজন সাধারণ স্বামী আনতে পারে কখনও?

কিন্তু মামলা তুমি করলেই তো পার?

হয়তো করতাম, কেবিনের বাইরে বেরুবার জন্যে তৈরি হয়ে জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে গেইল বলল, তবে দরকার কি—আমরা

দুজন এখন তো আর সব সময় একসঙ্গে থাকি না। কতদিন পর পর দেখা হয় আমাদের।

এবার মনে হয়, বেশ কিছুদিন তুমি তোমার স্বামীর সঙ্গে থাকবে—

না না, জোরে মাথা ঝাঁকাল গেইল, তা একেবারেই অসম্ভব। বেশিদিন এক জায়গায় থাকবার মেয়ে আমি নই। এই জাহাজে কিন্তু আমার খুব ভাল লেগেছে, তবে ওই লোকটা—

রজার্সের কথা বলে গেইল থামে, তবে ভাবি নি সে সত্যি এমন করে আমার প্রেমে পড়বে। বাপের বয়সী লোক—ওর রকম দেখে আমার হাসি পায়। বেগতিক দেখে কাল ওকে ড্যাডি বলে ডেকে আদর করলাম। ও তখন ছলোছলো চোখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ভাবি নি আজ ডাকতে আসবে। নির্লজ্জ—আবার এসেছে।

আজ আর ওর ধারে কাছে যাওয়া নয়—একেবারে এড়িয়ে চলতে হবে। বম্বেতে নেমে আমার স্বামীর সামনে কী ফ্যাসাদ বাধায় কে জানে। তুমি বেশ গম্ভীর প্রকৃতির লোক। আজ সারাদিন তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাক। কী গো তোমার নাম—এই ইণ্ডিয়ান মেয়ে?

ডেনমার্কের মেয়ে ইংগে আর তার স্বামী অমর সিং। এরা সব সময় নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তবু বিপাশার সঙ্গে দেখা হলে কাছে ডেকে হেসে কথা বলে। নিজেদের নানা পরিকল্পনার কথা জানায়। ইংগে অমর সিং-এর সঙ্গে তার প্রেমে পড়বার মধুর ইতিহাস শুনিয়ে আনন্দ পায়।

ওরা জোর করেই বিপাশাকে মাঝে মাঝে টেনে নিয়ে আসে নাচের ঘরে। যখন জল দেখার ক্লান্তি তার শরীরে একটা ঝিমঝিমানি ভাব নিয়ে আসে তখন অনেক সময় একা-একাই সে নিজেও এক

কোণায় চুপচাপ বসে নাচের বাজনা শোনে। স্কোয়াশের ছোট একটা গ্লাস থাকে তার হাতের কাছের ছোট টেবিলে।

বিদেশী নাচে বিপাশার খুব বেশি উৎসাহ নেই। আর এ-বিদ্যা আয়ত্ত করবার কোন চেষ্টাই সে কখনও করে নি। কিন্তু এখন তার কানে বাজনার দ্রুত তাল যেন সমুদ্র গর্জনের সঙ্গে এক হয়ে যায়। অসংখ্য যাত্রীর উল্লাসের প্রচণ্ড তোড়ে চারপাশ গমগম করে। বুনো আনন্দ কাঁপে চোখে।

ব্যবধানের প্রাচীর হঠাৎ যেন টুকরো টুকরো হয়ে যায় হালকা আনন্দের জোয়ারে। লঘু শরীর। ক্ষিপ্র পদক্ষেপ। উল্লাসের ছাড়া-ছাড়া চিৎকার। বিপাশা নিজের মনেই হাসে। উগ্র মত্ততায় মানুষের শক্তি সম্বন্ধেও সচেতন হয়।

নাচের আসর থেকে কিছুক্ষণের জন্যে বিশ্রাম করতে আসে ইংগে আর অমর সিং। তাদের ইশারায় ডাকে বিপাশা। তার পাশে দুটো খালি চেয়ার দেখায়। নাচের বাজনা থেমে গেছে এখন। কয়েক মুহূর্তের ছেদ। এখন পানীয়ের স্বাদ ক্লান্তি ঘুচিয়ে দেবে ইংগে আর অমর সিং-এর।

আজও স্কোয়াশ, বিপাশার দিকে তাকিয়ে ভাঙা-ভাঙা ইংরেজীতে বলে ইংগে।

তোমাকে তো অনেকবার বলেছি ইংগে, অমর সিং স্ত্রীর পাশে বসতে-বসতে বলে, ভারতবর্ষের মেয়েরা ইউরোপের মেয়েদের মতো ওসব পানীয়ের ভক্ত নয়—

কিন্তু ওই যে আর একজন, সহজ স্বরেই স্বামীকে জিজ্ঞেস করে ইংগে, সেও তো ইণ্ডিয়ান মেয়ে—

মনীষা এখন এখানে নেই। কিন্তু বিপাশা বুঝতে পারে তাকে মনে করেই কথা বলছে ইংগে। অমর সিং কি একটা বলতে যায় কিন্তু তাকে হাতের ইশারায় থামিয়ে দিয়ে বিপাশা নিজেই কথা বলে।

সাধারণত আমাদের দেশে মেয়েরা ড্রিঙ্ক করে না কারণ তার দরকার হয় না। তবে এদেশে বেশিদিন থাকলে হয়তো কেউ কেউ—

অমর সিং বলে, যাক গে ওসব কথা। আর একটা স্কোয়াশ চাই নাকি ?

না না, ধন্যবাদ।

ইংগে জিজ্ঞেস করে, তোমাকে কখনও নাচতে দেখি না কেন ?

পা নাচাতে-নাচাতে বিপাশা বলে, আমি পারি না।

তোমাদের দেশের নাচ তো জান নিশ্চয়ই।

না। তাও জানি না ইংগে।

ইংগে অবাক হয়ে ভাল করে দেখে বিপাশাকে। যে নৃত্যের তাল তাকে মাতিয়ে তোলে তাতে কোন ঝোঁক বিপাশার কেন নেই সেকথাটা সে কিছুতেই বুঝতে পারে না। আস্তে আস্তে পানীয়ের গ্লাসে চুমুক দেয় আর থেকে থেকে শরীর দোলায়।

অমর সিং চাপা স্বরে বলে, নাচ গান ছাড়া অন্য কোন বিষয় নিয়ে এরা মাথা ঘামাতে জানে না—একেবারে হালকা স্বভাবের মেয়ে—

অমর সিং এর স্বরে রূঢ় অবহেলার ঝাঁজ পেয়ে চমকে তার দিকে তাকায় বিপাশা, কে হালকা স্বভাবের মেয়ে ?

ও দেশের মেয়েরা, টেবিলের ওপর ঠক করে গেলাস রেখে অমর সিং বলে, যাদের মনে মনে শ্রদ্ধা করতে পারি না তাদের সঙ্গে বেশিদিন ঘর করা যায় না—এত খরচ করে ইংগেকে ভারতবর্ষে নিয়ে যাচ্ছি—কিন্তু আমি জানি ও কিছুতেই খুব বেশি দিন আমার সঙ্গে থাকবে না—

তাহলে ওকে বিয়ে করলে কেন ?

কেন, মুখের কাছে কাচের পাতলা গেলাস তুলে এনে চতুরের মতো চারপাশে তাকায় অমর সিং, তার একটা বড় কারণ আছে নিশ্চয়ই—

ইংগে হাসতে হাসতে বলে, তোমরা কি ভাষায় কথা বলছ আমি কিছু বুঝতে পারছি না—

তার চুলে হাত বুলিয়ে অমর সিং বলে, আমরা তোমার প্রশংসা করছি ইংগে, সে হিন্দীতেই কথা বলে যায়, দেশে ফিরে আমি একটা নাইট ক্লাব খুলব ঠিক করেছি। আর ইংগে—আপনি তো বুঝতেই পারছেন আমাকে কতখানি সাহায্য করতে পারবে এ-বিষয়ে—

বিপাশা বলে, আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।

না বোঝবার কিছু নেই, গেলাসটা খালি করে দিয়ে অমর সিং বলে, অমন আরো অনেক ক্লাব আছে আমাদের দেশে—সেগুলোর সঙ্গে আমার পক্ষে একা পাল্লা দেওয়া হয়তো কঠিন, স্টুয়ার্ডকে ডেকে গেলাস ভরে দিতে বলে অমর সিং, কিন্তু যদি আমার বিদেশিনী স্ত্রী সেই ক্লাবের ভার নেয় আর সারা রাত মাতিয়ে রাখে দর্শকদের' তাহলে কে পাল্লা দেবে আমার সঙ্গে—হা হা করে হাসতে হাসতে অমর সিং বলে, টাকা না থাকলে সংসারে কিছুই থাকে না—সেকথাটা আমি খুব ভাল করে বুঝেছি বলেই একে বিয়ে করে দেশে নিয়ে যাচ্ছি—

ইংগে হঠাৎ বাধা দিয়ে বলে, গেলাস ভরে দিতে বল! অমর সিং চিৎকার করে ডাকে, স্টুয়ার্ড! তারপর হাসিমুখেই বলে যায় বিপাশাকে, যদি অন্য কোন বিদেশিনীকে আমি এ-কাজের জন্যে রাখতাম তাহলে মাসে মাসে আমার কী পরিমাণ টাকা খরচ হত একবার ভেবে দেখুন!

কিন্তু অমর সিং-এর কথা শুনতে শুনতে বিপাশার মনে হঠাৎ আঘাত বেজে ওঠে আর মনে হয় প্রেমের মধ্যেও মানুষের ব্যবসায়ী বুদ্ধি প্রবল হয়ে ওঠে কেন।

অমর সিং যখন বিপাশার কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় এসব কথা বলছিল তখন জ্বলন্ত এক আক্রোশে সমস্ত শরীর রী রী করে উঠেছিল বিপাশার।

ইচ্ছে হয়েছিল ইংগেকে সব কথা বলে তার স্বামীর আসল স্বরূপ প্রকাশ করে দেয়। পর মুহূর্তেই মনে হল, কি হবে ওসব করে।

সাধারণত আমাদের দেশে মেয়েরা ড্রিঙ্ক করে না কারণ তার দরকার হয় না। তবে এদেশে বেশিদিন থাকলে হয়তো কেউ কেউ—

অমর সিং বলে, যাক গে ওসব কথা। আর একটা স্কোয়াশ চাই নাকি?

না না, ধন্যবাদ।

ইংগে জিজ্ঞেস করে, তোমাকে কখনও নাচতে দেখি না কেন?

পা নাচাতে-নাচাতে বিপাশা বলে, আমি পারি না।

তোমাদের দেশের নাচ তো জান নিশ্চয়ই।

না। তাও জানি না ইংগে।

ইংগে অবাক হয়ে ভাল করে দেখে বিপাশাকে। যে নৃত্যের তাল তাকে মাতিয়ে তোলে তাতে কোন ঝোঁক বিপাশার কেন নেই সেকথাটা সে কিছুতেই বুঝতে পারে না। আস্তে আস্তে পানীয়ের গ্লাসে চুমুক দেয় আর থেকে থেকে শরীর দোলায়।

অমর সিং চাপা স্বরে বলে, নাচ গান ছাড়া অন্য কোন বিষয় নিয়ে এরা মাথা ঘামাতে জানে না—একেবারে হালকা স্বভাবের মেয়ে—

অমর সিং এর স্বরে রূঢ় অবহেলার ঝাঁজ পেয়ে চমকে তার দিকে তাকায় বিপাশা, কে হালকা স্বভাবের মেয়ে?

ও দেশের মেয়েরা, টেবিলের ওপর ঠক করে গেলাস রেখে অমর সিং বলে, যাদের মনে মনে শ্রদ্ধা করতে পারি না তাদের সঙ্গে বেশিদিন ঘর করা যায় না—এত খরচ করে ইংগেকে ভারতবর্ষে নিয়ে যাচ্ছি—কিন্তু আমি জানি ও কিছুতেই খুব বেশি দিন আমার সঙ্গে থাকবে না—

তাহলে ওকে বিয়ে করলে কেন?

কেন, মুখের কাছে কাচের পাতলা গেলাস তুলে এনে চতুরের মতো চারপাশে তাকায় অমর সিং, তার একটা বড় কারণ আছে নিশ্চয়ই—

ইংগে হাসতে হাসতে বলে, তোমরা কি ভাষায় কথা বলছ আমি কিছু বুঝতে পারছি না—

তার চুলে হাত বুলিয়ে অমর সিং বলে, আমরা তোমার প্রশংসা করছি ইংগে, সে হিন্দীতেই কথা বলে যায়, দেশে ফিরে আমি একটা নাইট ক্লাব খুলব ঠিক করেছি। আর ইংগে—আপনি তো বুঝতেই পারছেন আমাকে কতখানি সাহায্য করতে পারবে এ-বিষয়ে—

বিপাশা বলে, আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।

না বোঝবার কিছু নেই, গেলাসটা খালি করে দিয়ে অমর সিং বলে, অমন আরো অনেক ক্লাব আছে আমাদের দেশে—সেগুলোর সঙ্গে আমার পক্ষে একা পাল্লা দেওয়া হয়তো কঠিন, স্টুয়ার্ডকে ডেকে গেলাস ভরে দিতে বলে অমর সিং, কিন্তু যদি আমার বিদেশিনী স্ত্রী সেই ক্লাবের ভার নেয় আর সারা রাত মাতিয়ে রাখে দর্শকদের তাহলে কে পাল্লা দেবে আমার সঙ্গে—হা হা করে হাসতে হাসতে অমর সিং বলে, টাকা না থাকলে সংসারে কিছুই থাকে না—সেকথাটা আমি খুব ভাল করে বুঝেছি বলেই একে বিয়ে করে দেশে নিয়ে যাচ্ছি—

ইংগে হঠাৎ বাধা দিয়ে বলে, গেলাস ভরে দিতে বল! অমর সিং চিৎকার করে ডাকে, স্টুয়ার্ড! তারপর হাসিমুখেই বলে যায় বিপাশাকে, যদি অন্য কোন বিদেশিনীকে আমি এ-কাজের জন্যে রাখতাম তাহলে মাসে মাসে আমার কী পরিমাণ টাকা খরচ হত একবার ভেবে দেখুন!

কিন্তু অমর সিং-এর কথা শুনতে শুনতে বিপাশার মনে হঠাৎ আঘাত বেজে ওঠে আর মনে হয় প্রেমের মধ্যেও মানুষের ব্যবসায়ী বুদ্ধি প্রবল হয়ে ওঠে কেন।

অমর সিং যখন বিপাশার কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় এসব কথা বলছিল তখন জ্বলন্ত এক আক্রোশে সমস্ত শরীর রী রী করে উঠেছিল বিপাশার।

ইচ্ছে হয়েছিল ইংগেকে সব কথা বলে তার স্বামীর আসল স্বরূপ প্রকাশ করে দেয়। পর মুহূর্তেই মনে হল, কি হবে ওসব করে।

বোধহয় ইংগে সব জেনে শুনে অমর সিংকে বিয়ে করেছে। কিম্বা সে-ও স্বামীকে দিয়ে অমন কোন স্বার্থ উদ্ধার করে নেবে বলে ঠিক করেছে।

এইতো সংসার। কে ইংগেকে জোর করে সব কথা বোঝাবে!

যদি ও নিজে কোনদিন নির্মম অভিজ্ঞতা দিয়ে স্বামীকে বুঝতে পারে তাহলেই হয়তো সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রতিবাদ জানাবে। বিপাশা আগে থেকে তাকে সতর্ক করে দিতে গেলে হয়তো ওদের তুজনের কাছে শুধু নিজেকে ছোটো করবে।

মাঝে মাঝে এমনি হয় বিপাশার। কোথা থেকে কোন চিন্তা মনে উঁকি মারে আর ওর সমস্ত কিছু বিস্বাদ হয়ে যায়। নাচের ঘরে যেতে তার আজ ইচ্ছে হল না। তাই ওরা যেদিকে বসে ছিল সেদিকে না গিয়ে বিপাশা অন্য দিকে গেল।

•

মনীষার সঙ্গে বিপাশা তু-একদিন ট্যুরিস্ট ক্লাসে ঘুরে এসেছে। আজ ওই যাত্রীদের খবর নিতে ইচ্ছে করল বিপাশার। জান্নুকে এড়াবার জন্যে মনীষা এখন আর ওদিকে যায় না। তাই বিপাশা একাই গেল।

এদের তার মন্দ লাগে না। পাঁচু, ইসমাইল, করিম, ভবসিন্ধু আর তার স্ত্রী সিবিল। এদের সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পায় বিপাশা। এরা তাকে নানা ভাবনা ভাবায়।

হয়তো মনীষা না থাকলে ট্যুরিস্ট ক্লাসের দিকে আসা হত না তার। এসে তার লাভ হয়েছে। না হলে বিপাশা এদের সন্ধান হয়তো পেত না।

জান্নুকে কোথাও দেখা গেল না। আসলে আজ তাকে দেখতেই বিপাশা এসেছে। সে জানতে চায় মনীষার কাছ থেকে কঠিন আঘাত পেয়ে তার মনের-অবস্থা কেমন। হয়তো ভদ্রবাড়ির মেয়েদের সম্পর্কে তার ধারণা বদলে গেছে।

যদি সত্যি বদলে যায় তাহলে মনে মনে খুশি হবে বিপাশা। আড়ম্বরের কঠিন জাল যারা পেতে রাখে জাম্মুর মতো মানুষের জন্যে আর মাছের মতো বন্দী করে খুশি মতো খেলায়, ঠিক এই মুহূর্তে তাদের ওপর তার কোন সমবেদনা জাগে না।

জীবনের রূপটা আস্তে আস্তে বদলে যায় বিপাশার চোখে। বিতৃষ্ণায় মাথা ঝিমঝিম করে। মনীষা অমর সিং আর গেইল— প্রত্যেকের মধ্যে সে যেন একটা নিষ্ঠুর মিল খুঁজে পায় আর ভাবতে ভাল লাগে না সে নিজেও তাদের সমাজের একজন।

বিলেত যাবার আগে এ-সমাজের মানুষের ওপর তার কোন শ্রদ্ধা ছিল না বলেই সে দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে পেরেছিল। ভেবেছিল স্বাধীন দেশের রীতিনীতি একেবারে অন্য রকম হবে আর সে সেখানে মানিয়ে নিতে পারবে অনুকূল আবহাওয়ায়। কোথাও না কোথাও একটা অবলম্বন খুঁজে পাবে।

সেখানেই ভুল করেছিল বিপাশা। সকলকে ছেড়ে সমাজের বাইরে অনেক দূরে কোথাও গিয়ে নির্জন সাধনায় সে কাটাতে চেয়েছিল একটির পর একটি শান্তিপূর্ণ দিন।

যদি সে দেশ ছেড়ে না বেরিয়ে পড়তে পারত তাহলে হয়তো চলে যেত কোন আশ্রমে—যেখানে তার চোখের সামনে দম্ভ আর বঞ্চনার কোন ছবি ভেসে উঠত না। কিন্তু বিদেশে এসে হঠাৎ নিজের সেই ভীরু মনটাকে আবিষ্কার করে বিপাশা। আর তার পলায়নী মনোবৃত্তির কথা ভেবে হাসি পায়। সে-জীবন যেন ভীরু ব্যর্থ ম্লান। প্রতিবাদহীন ক্লান্ত এক-একটি দিন। না, মূক জীবনে তার আর আস্থা নেই।

কিন্তু স্বাধীন দেশের রীতিনীতির সঙ্গে তার নিজের দেশের তেমন কোন অমিল চোখে পড়ে নি বিপাশার। সেই এক কৌশলেই কঠিন জালে নিরীহ মানুষকে ধরবার নানা চেষ্টা। বঞ্চনার এক-একটি রুপোলী তীর ঘরে-বাইরে চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে।

আঘাত খেয়ে-খেয়ে জেগে উঠুক জান্নুর মতো যত মানুষ!

এস এস, মেমসাহেব, বুড়ো ইসমাইল পাইপ ঠুকে বলল, আর তো মোটে কয়েকদিন, তারপর যে যার ঘরে ফিরে যাবে—

সে কথা মনে করে আপনার খুব ভাল লাগছে বুঝি?

গম্ভীর হয়ে মাথা নেড়ে ইসমাইল বলল, আমাদের আবার ঘর—ঘর খুঁজতে তো পৃথিবী ঢুঁড়ে ফেললাম। কিন্তু ঐ খোঁজাখুঁজি করতেই জীবন গেল।

ভবসিন্ধু বলল, ঠিক বলেছ দাদা!

তোমার আবার ভাবনা কী? বিলাতী বউ নিয়ে ঘরে ফিরে যাচ্ছ—

আমার ঘর দাদা! দীর্ঘশ্বাস ফেলল ভবসিন্ধু।

বেশ ভয় লাগছে ভবসিন্ধুর এখন। সিবিল তাকে বড়লোক মনে করে বিয়ে করেছে। কিন্তু দেশে তার বাড়ির চেহারা দেখে কী ভাববে সে? এসব কথা ভবসিন্ধুর আগে কখনও মনে হয় নি, কিন্তু জাহাজ যত বম্বের কাছে এগিয়ে যাচ্ছে ততই যেন দারিদ্র্যের লজ্জা এসে ঘিরে ধরছে তাকে।

সিবিলকে দেশে না নিয়ে এলেই ভাল হত। কোন লজ্জায় তাকে ভাঙা ঘরে নিয়ে তুলবে সে। তাই আজকাল গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে থাকে ভবসিন্ধু।

সিবিল, বিপাশা এগিয়ে এসে বলল, নামবার জন্য প্রস্তুত হও, দেশ তো এসে গেল।

জানি, সিবিল হেসে বলল, আমি চিরকাল ভারতবর্ষে থাকব জান?

কেন? আর কোনদিন তুমি দেশে ফিরে যাবে না?

সেকথা পরে ভাবব। শুনেছি ভারতবর্ষে সকলেই খুব বড়লোক। ছেলেবেলা থেকে ওদের সঙ্গে বাস করবার খুব ইচ্ছে আমার।

সিবিলের কথা শুনে বিপাশা শুধু ভাবল সকলের সব ইচ্ছে

রাতারাতি পূর্ণ হয় না। ভারতবর্ষে গিয়ে ভবসিন্ধুর অবস্থা দেখে সিবিল যখন হতাশ হবে তখন হয়তো পালাতে পথ পাবে না।

কিন্তু তবু অমর সিংকে বিপাশার যত ছোটো মনে হয় ভবসিন্ধুকে তত মনে হয় না। এদের কথা শুনতে ভাল লাগে বিপাশার। ডেকের রেলিঙে দুই হাত রেখে জলের দিকে তাকিয়ে সে এদের কথাই ভাবে।

এরা বিদেশে গিয়েছিল ব্যবসা করতে—নিজেদের অবস্থা ফিরিয়ে নিতে—ভালভাবে খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে।

কিন্তু কী হল? নতুন উপসর্গ দেখা দিল শুধু। এরা বিয়ে করল, অর্থকষ্ট পেল, স্ত্রীকে আঘাত দিল কিন্তু অবস্থা ফিরল না এদের কারোর। দেশ থেকে পালিয়ে অন্য দেশে গেলেই তো অবস্থা ফেরানো যায় না। তাই এরা এদেশ-ওদেশ করে এখনো ঘর খুঁজে ফিরছে।

খুঁজুক—বিপাশা ভাবল, পৃথিবী ঘুরে এরা নিজেদের অবস্থা বুঝুক। তাহলে একদিন হয়তো পাগলের মতো শুধু ঘর না খুঁজে সারা পৃথিবীতে এদের মতো লোক যত আছে তাদের সকলের মিলিত শক্তি দিয়ে শান্তির নীড় বাঁধতে শিখবে। আজকের দিনে চিরকাল দুঃখ কেউ পেতে পারে না—সেকথা সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করে বিপাশা।

সিবিলের দিকে বিপাশা ভাল করে তাকিয়ে দেখে। ভরা শরীর। নীল চোখ। দুই চোখে কৌতুক। যেন কৌতুকময়ীর মতোই সে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে অনেক দূরে কোথাও ভেসে চলেছে।

ভবসিন্ধু দেখছে বিপাশা আর সিবিলকে। দেখছে আর মনে মনে তুলনা করছে দুজনের। সিবিলও একবার ফিরে দেখে ভবসিন্ধুকে। আর তখন সে এগিয়ে আসে এদের দুজনের কাছে। হাসি না পেলেও জোর করে হাসে।

সেই এক কথাই বলে ভবসিন্ধু, দেশ তো এসে গেল।

কোথায়, ঝুঁকে পড়ে অনেক দূরে তাকায় বিপাশা, এখনও অনেক দেরি!

যত দেরি হয় তত ভাল।

কেন? অল্প হেসে বিপাশা ভবসিন্ধুকে জিজ্ঞেস করে, দেশে থাকতে আপনার ভাল লাগে না?

লাগে বলেই তো দু-তিন বছর বাদ বাদ দেশে যাই কিন্তু এবার যেতে একটু ভয় লাগে।

কৌতূহলী হয়ে বিপাশা জিজ্ঞেস করে, এবার যেতে ভয় লাগে কেন?

সিবিলের দিকে একবার তাকায় ভবসিন্ধু। ওর কান নেই এদের কথায়। আঙুল ঠেকিয়ে ও তখন বিপাশার শাড়ির পাড় পরখ করছে। আর বালা ছুঁয়ে ছুঁয়ে ভাবছে অলঙ্কারের ওপর এমন কাজ কেমন করে সম্ভব।

তখন ভবসিন্ধু ফিসফিস করে বলে, ও ভাবে আমার অনেক টাকা। দেশে গিয়ে ফুর্তিতে দিন কাটাবে, যেন ভবসিন্ধুর সব কথা বুঝতে পারছে সিবিল—এমন একটা ভাব নিয়ে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ও বলে যায়, কিন্তু আমি জানি দেশে গিয়ে ওর মাথাটা খারাপ হয়ে যাবে—

সব বুঝতে পারলেও ভবসিন্ধুকে সান্ত্বনা দেয়ার ইচ্ছায় বিপাশা জিজ্ঞেস করে, কেন?

অবহেলার একটা ভাব ফুটে ওঠে ভবসিন্ধুর কথায়, দুঃখ কষ্টে দিন কাটাবার মেয়ে নাকি এরা?

তার কথা শুনে চমকে উঠে বিপাশা বলে, স্বামী ভাল হলে সব মেয়ে সব অবস্থায় দিন কাটাতে পারে—

এরা পারে না, হঠাৎ খুক খুক করে ভবসিন্ধু হাসতে থাকে, বার্মিংহামে ব্যবসা করে আমি যদি টাকা করতে না পারতাম তাহলে আমাকে সিবিল কখনই বিয়ে করত না—বুঝলেন?

নিজের নাম শুনে স্বামীর কাঁধে হাত রেখে সিবিল জিজ্ঞেস করে, আমার কথা কি বলছ গো?

সঙ্গে সঙ্গে ভবসিন্ধু উত্তর দেয়, বলি যে তুমি খুব ভাল মেয়ে!

হাসতে হাসতে সিবিল বলে, নিশ্চয়ই। ভাল মেয়ে না হলে

বাপ-মা আর সব আত্মীয়-স্বজনকে চটিয়ে দিয়ে একটা বিদেশীর সঙ্গে ভাসতে-ভাসতে কি এক অজানা দেশে যাই ?

একটা সরল বিদেশী মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বিপাশা জিজ্ঞেস করে, হঠাৎ এক অজানা দেশে কেন যাচ্ছ তুমি সিবিল ?

স্বামীর দেশ দেখতে কার না ইচ্ছে হয় ?

কিন্তু সে-দেশ যদি তোমার ভাল না লাগে ?

ভাল লাগবেই।

বিপাশা বলে, কিন্তু তোমার স্বামী বলে, ভাল লাগবে না। আর তখন তুমি নাকি ওকে ছেড়ে তোমার নিজের দেশে পালিয়ে যাবে—

ভবসিন্ধুর দিকে তাকিয়ে সিবিল জিজ্ঞেস করে, তুমি বলেছ একথা ?

ভয়ে-ভয়ে ভবসিন্ধু মাথা নাড়ে, হ্যাঁ।

তোমাকে যদি আমার ভাল না লাগে তাহলেই আমি পালিয়ে যাব, দৃঢ় স্বরে সিবিল বলে, অন্য কোন কারণে নয়—

হাসি মুখে বিপাশা বলে, ঠিক ?

হ্যাঁ, ঠিক।

ভবসিন্ধু এক-পা সরে গিয়ে বলে, টাকা না থাকলে এরা কখনই থাকে না দিদি !

বিপাশার তখন বলতে ইচ্ছে করে, কে-ই বা থাকে ! কিন্তু হঠাৎ কারুর সঙ্গেই তার আর কোন কথা বলতে ইচ্ছে করে না। চিন্তার একটা কঠিন জাল তাকে যেন আস্তে আস্তে দৃঢ় বন্ধনে বাঁধে।

সামনে অপার পারাবার। বহুমূল্য রত্নসম্ভারের মতো উদ্বেল তরঙ্গমালার ওপর প্রখর সূর্যের অবাধ আলো চিকচিক করছে। হাওয়ার জোর ঠিক এই মুহূর্তে সহ্য করতে পারছে না বিপাশা। বিষের তিক্ত একটা স্বাদ এসে লাগছে জিবে। মাথা ঝিমঝিম করছে।

কিন্তু ভবসিন্ধু আর সিবিল ছাড়া ওকে এখন আর কেউ লক্ষ্য করছে না। বেসুরো হারমোনিয়ম বাজছে। শতরঞ্জি আর মাদুরের

ওপর ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছে ভবসিন্ধুর বন্ধুবান্ধব। ওদের গানের কথাও স্পষ্ট বুঝতে পারছে বিপাশা।

সিবিল আর ভবসিন্ধুকে গল্প করবার সুযোগ দিয়ে সে একটু দূরে সরে যায়। মনটা ভারী হয়ে উঠেছে হঠাৎ। সমুদ্রের খোলা হাওয়ায় বিষ-বিষ কেমন একটা ঝাঁজ। তবু দাঁড়িয়ে থাকে বিপাশা চুপ করে। তবু সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকে।

পাইপের ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে আধবুড়ো ইসমাইল বিপাশার পাশে এসে দাঁড়ায়। গায়ে রঙিন একটা শার্ট। গরম প্যান্ট। তার কোটের সব কটা বোতামই খোলা। সকালে উঠেই নিয়ম মতো দাড়ি কামিয়েছে ইসমাইল। মুখে অল্প সাদা পাউডারও ঘষেছে বোধহয়।

মেমসাহেব, খুব আস্তে ডাকে ইসমাইল।

বলুন ? চমকে ঘুরে দাঁড়ায় বিপাশা।

আহা হা, মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে ব্যস্ত হয়ে ইসমাইল বলে, আমাকে আজ্ঞে-আপনি বলে কথা বললে বড়ই লজ্জা পাই মেমসাহেব !

বাঃ, বিপাশা হেসে বলে, আপনি আমার চেয়ে বয়সে বড় না ?

বয়সে বড় হলেই বা কি, পাইপ টানতে টানতে ইসমাইল বলে, মুখ্যু মানুষ আমরা—আপনাদের চেয়ে কত ছোট—

বাধা দিয়ে বিপাশা বলে, বিদেশে এতদিন ব্যবসা করে এখনও এসব কথা বলেন কেমন করে ইসমাইল সাহেব ?

পাইপ নামিয়ে বিপাশার দিকে ভয়ে-ভয়ে তাকায় ইসমাইল, অন্যায় কিছু বললাম নাকি মেমসাহেব ?

হাসিমুখে বিপাশা বলে, নিশ্চয়ই। আপনাদের যারা চিরকাল ছোট করে রেখেছে—এখনও তাদের কাছে ছোট হয়ে থাকতে চান কেন ?

তা, পাইপটা দেখতে দেখতে ইসমাইল বলে, ছোট করে রাখবে কেন মেমসাহেব ? আমরা নিজেরাই তো ছোট—

এতদিন বিলেতে ব্যবসা করে এই ধারণা হল আপনার ?

ইসমাইল সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়, হ্যাঁ। যেখানে যাই না কেন, কথাটা তো আর মিছা নয়।

হ্যাঁ, বিপাশা ইসমাইলের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, একেবারে মিথ্যে। কই, বিলেতে কেউ কাউকে আলাদা করে রাখে ?

হি-হি করে হাসে আধবুড়ো ইসমাইল, রাখে মেমসাহেব—রাখে। পৃথিবীর সব জায়গা তো ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে দেখলাম। কালো চামড়া—সাদা চামড়ার কথা ছেড়ে দিন—ও নিয়ে মাথা ঘামাবার মেজাজ নাই আর আমাদের। কিন্তু সব দেশেই বড়লোক আর গরিব—দুটো একেবারে আলাদা জাত—

কিন্তু বিলেতে গরিবকে কেউ ছোট করে দেখে না!

আরও জোরে হেসে ওঠে ইসমাইল, কে বলে সেকথা মেমসাহেব ? আপনি দূর থেকে দেখেছেন কি-না তাই একথা ভাবতে ভাবতে খুশি মনে বাড়ি যান—পাইপটা অনেকক্ষণ দাঁত দিয়ে চেপে রাখে ইসমাইল, আর আমরা গরিব কি-না তাই যেখানেই থাকি না কেন, গরিবের সঙ্গে ঘর আমাদের করতেই হয়—আর তাদের ঘরের কথা আমরা ভাল করেই টের পাই—আপনারা কেমন করে সেসব কথা জানতে পারবেন মেমসাহেব!

ইসমাইলের কথা যেন বিশ্বাস করতে পারে নি এমন স্বরে বিপাশা জিজ্ঞেস করে, তাহলে এতদিন বিলেতে ব্যবসা করে আপনার কোন লাভই হয় নি বলতে চান ?

জিভ কেটে তাড়াতাড়ি ইসমাইল বলে, না-না মেমসাহেব, সেকথা বলব কেন ? রাতারাতি বড় মানুষ হতে পারি নি সেকথা ঠিক বটে—কিন্তু খেয়ে-পরে দেশ-বিদেশ ঘুরে তো বেঁচে আছি। একটু থেমে ইসমাইল বলে, আর আগের চেয়ে অনেক ভাল আছি, সে হাসে, পায়ে এখন জোর হয়েছে। বুকে বল হয়েছে। আর রোজ দুবেলা খাওয়াও

দেখি ঠিক মতো জুটে যায়। তবে একটা কথা কি জানেন? বিপাশার দিকে তাকিয়ে অল্প অল্প হাসে ইসমাইল।

কি?

ছেলে-ছোকরাদের মন বিলাতে গিয়ে বড়ই দুর্বল হয়ে পড়েছে। ওরা দেখি বেশ ঝিমিয়ে পড়ে আজকাল।

কৌতূহলী চোখে বিপাশা জিজ্ঞেস করে, কেন?

একটু ইতস্তত করে ইসমাইল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে নেয়। সিবিল কি কথা মনে পড়ে যাওয়ায় জোরে-জোরে হাসছে। থমথমে মুখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে ভবসিন্ধু। একমনে বেসুরো হারমোনিয়ম বাজিয়ে চলেছে পাঁচু। বাচ্চাদের সামলাতে ব্যতিব্যস্ত করিম। ফস করে দেশলাই জ্বালায় ইসমাইল।

টাকার ধান্দা এদের আর তেমন নাই মেমসাহেব কিন্তু নতুন ধান্দার চাপে এরা চোখে এখন অন্ধকার দেখে, মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে ধোঁয়া ছেড়ে ইসমাইল বলে, অপরাধ নেবেন না—এদের সব ভাবনা এখন বিলাতী বউ-এর জন্যে।

বিপাশা হেসে বলে, ভালই তো।

কিন্তু ভাবনায়-ভাবনায় শুকিয়ে গেল এরা, একটা কথা যেন বিপাশাকে কিছুতেই বোঝাতে পারে না ইসমাইল, মেমসাহেব, আমি খোলসা করে সব কথা বলতে পারি না আপনাকে। মুখ্যু মানুষ—কথাবার্তা তেমন কইতে পারি না তো—

বলুন? আপনার সব কথাই আমি বুঝতে পারি।

পাঁচু করিম আর ভবসিন্ধুর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ইসমাইল বলে, দেশে থাকতে এদের শুধু পেটের ভাবনা ছিল—ক্ষুধা মেটাবার জন্যে অভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারত সারাদিন। কিন্তু এখন—দেখেন না মেমসাহেব ওদের মুখ? শুকিয়ে গেল—আর বুকও জ্বলে গেল—

বিপাশা আস্তে জিজ্ঞাসা করে, কেন?

বিদেশে এসে ওদের প্রাণ পুড়তে শুরু করেছে মেমসাহেব। এত মেয়ের সঙ্গে ভাব করবার অবসর ওদের দেশে তো ছিল না। তাই ওই এক ভাবনায় ওরা ভেঙে পড়ল—দু-এক মিনিট চুপ করে থেকে ইসমাইল বলে, তাই বলি, এখন ওদের মনের আর তেমন জোর নাই। ওদের প্রাণ পুড়তে লেগেছে মেমসাহেব!

যদিও খুব পরিষ্কার করে সত্যিই ইসমাইল সব কথা বোঝাতে পারে না কিন্তু তবুও তার অস্পষ্ট বর্ণনা থেকে হঠাৎ যেন এক নতুন সত্য আবিষ্কার করে বিপাশা। তখন সে ওই মানুষগুলোর দিকে আর একবার তাকিয়ে দেখে। হ্যাঁ, ঝিমিয়ে পড়েছে ওরা। ভয়-ভয় ভাব ফুটে উঠেছে মুখে। যেন একটু ভাল করে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় মনের বিকট এক যন্ত্রণা ওদের সব কর্মক্ষমতা হরণ করে নিয়েছে।

বিপাশা বলে, ঠিক বলেছেন।

জুতোর তলায় জোরে-জোরে পাইপ ঠোকে ইসমাইল, তাই আমার দুঃখ হয় ওদের জন্যে। কি করি বলুন, কিছু বলতে পারি না ওদের। বুড়ো মানুষ, আমার কথা ওরা শুনবে কেন! হঠাৎ হেসে ওঠে ইসমাইল, আর বলেই বা হবে কি, মনের ওপর হাত আছে নাকি মানুষের! পাইপটা প্যান্টের পকেটে রাখতে রাখতে সে বলে, বিলাতে এসে নিজের মনটাকে এরা খুঁজে পেয়েছে বটে!

আস্তে আস্তে বিপাশা সরে যায় সেখান থেকে। সে মনে মনে ভাবে, এক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে ওরা দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দিয়েছিল—সেখানে গিয়ে সভ্যতার আঁচ লেগেছে ওদের গায়ে। আর সভ্য সমাজের সঙ্গে তাল রেখে নিয়ম-কানুন মানতে গিয়ে মনটা জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে ওদের।

কিন্তু প্রেমের এই যন্ত্রণার কথা বিপাশা নিজে আজকাল যেন ভুলে গেছে। শেষ বয়স অবধি মন-পোড়ানো এক ভাবনা কিম্বা মুহুর্মুহুঃ স্মৃতির দংশন— এসব তার জীবনে আর নেই। আর নেই বলেই নিজের মধ্যে অদ্ভুত একটা শক্তির স্বাদ পাচ্ছে সে। পাখির

পালকের মতো হালকা মনে হয় তার শরীর। মুখে কিম্বা কপালে কখনও ভাবনার কোন কঠিন রেখা পড়ে না। ম্লান মুখে ছটফট করতে হয় না ঘরের কোণে বসে। আর জোর করে চাপানো কর্তব্যের বোঝা বইতে বইতে অকাল বার্ধক্যের ছাপ পড়ে না তার শরীরে।

সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে যেন বিপাশার জন্যে হঠাৎ একটা নতুন জগতের দ্বার খুলে যায়। একটা নতুন সংসার—একটা নতুন পরিবেশ। যেখানে আনন্দ আছে কিন্তু যন্ত্রণা নেই। বন্ধন যেখানে প্রতিদিন তিল তিল মৃত্যু নিয়ে আসে না।

মনের এই যন্ত্রণা থেকে কবে মুক্তি পাবে মানুষ!

সভ্যতার আঁচ গায়ে লাগবার সঙ্গে সঙ্গে মনটা বদলে গেছে ভবসিন্ধুর। ব্যবসায়ীর চোখে সে এখন তাকায় সিবিলের দিকে। যেন টাকা দিয়েই তার প্রেম কিনেছে। জলের দিকেই তাকিয়ে থাকে বিপাশা। শুধু জল আর জল।

পাহাড়ের মতো জলের একটা প্রচণ্ড তোড় দিগন্ত কাঁপিয়ে কেন ছুটে আসে না? কেন ডুবিয়ে দেয় না এই পৃথিবীকে? তারপর আবার হঠাৎ কচি একটা ঘাস ফুলে উঠুক। একটা নতুন ঘাস। একটা নতুন ফুল ফুটে উঠুক। প্রত্যেকটি মানুষ আস্তে আস্তে নতুন হয়ে উঠুক। যন্ত্রণার শেষ রেখাটাও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক মানুষের মন থেকে।

হ্যাঁ, এইটাই সুরমা আর অবনী ঘোষালের কেবিন। পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় বিপাশা। হয়তো এমন করে এখানে দাঁড়িয়ে সে স্বামী-স্ত্রীর তর্ক শুনত না। কিন্তু অবনী ঘোষালের মুখে নিজের নামের বিকট উচ্চারণ শুনে তার পা দুটো যেন জাহাজের পালিশ করা কাঠের সঙ্গে লেগে একেবারে স্থির হয়ে যায়।

ওই বদমাইস মেয়েটা, দাঁতে দাঁত চেপে বলে অবনী ঘোষাল, নামের চটক আছে বটে—বিপাশা—

বিদ্বেষ ফুটে ওঠে সুরমার স্বরে, ওঁর নামে তুমি যা-তা কথা বলো না!

একটা অট্টহাসির শব্দ শুনতে পায় বিপাশা। অবনী ঘোষাল হা-হা করে হেসে ওঠে, কেন বল তো?

তুমি ওঁকে চেন না, গম্ভীর স্বরে বলে সুরমা, একজন মহিলার নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে আমার কাছে নিজেকে ছোট করে তুল না।

নিষ্ঠুর কর্কশ স্বর অবনী ঘোষালের, মিথ্যা অপবাদ মানে? তুমি ওর খবর আমার চেয়ে বেশি রাখ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, সাহস অনেক বেড়ে গেছে সুরমার, আমি তোমার চেয়ে ওঁর খবর অনেক বেশি রাখি—

তোমরা সকলেই সমান। তোমাদের সকলের চরিত্রই এক, যেন গর্জন করে ওঠে অবনী ঘোষাল, সুযোগ পেলে তুমিও ওর মতো আমার মুখে কালি ছিটিয়ে একদিন বেরিয়ে পড়বে।

এবার সুরমা হেসে ওঠে, ঠিক—ঠিক বলেছ।

বোধহয় সুরমার একটা হাত শক্ত করে ধরে অবনী ঘোষাল, কি বললে?

আমি কিছু বলি নি। উঃ—হাত ছেড়ে দাও—

আর একবার বল?

তুমিই তো আমার মনের কথা বলে দিলে—যে সুযোগ পেলে তোমার মুখে কালি ছিটিয়ে—

যেন জ্ঞান থাকে না অবনী ঘোষালের, ফের যদি দেখি যে ওই বদমাইস মেয়েমানুষটার সঙ্গে তুমি একটাও কথা বলেছ তাহলে আমি তোমাকে সমুদ্রে ফেলে দেব—

তুমি সব পার আমি জানি—কিন্তু কথা আমি ওঁর সঙ্গে বলবই। তোমার যা খুশি তুমি করতে পার।

সুরমা!

আমাকে ভয় দেখিও না। সমুদ্র দেখতে দেখতে আমার সব ভয় ভেঙে গেছে—

আর একবার চিৎকার করে ওঠে অবনী ঘোষাল, সুরমা, তুমি আমাকে চেন না।

কলকল হাসির একটা ছন্দ যেন ভেঙে পড়ে বিপাশার কানের কাছে, তোমাকে চিনি না আমি! আমার চেয়ে ভাল করে কে তোমাকে চেনে বল?

আমি তোমার সঙ্গে রসিকতা করছি না এখন।

তা আর আমি জানি না? তোমার সঙ্গে কি আমার রসিকতার সম্পর্ক? কিন্তু আর একবার বলি, তুমি ঠিকই বলেছ, সত্যি আমি একটা ভয়ঙ্কর সুযোগের অপেক্ষায় আছি—

আমি তোমাকে জলে ফেলে দেব সুরমা!

দাও না। তাহলে—হাসতে হাসতেই সুরমা বলে, আমি বেঁচে যাব। আমার শরীরের সব বাঁধন এক মুহূর্তে খুলে যাবে। হাঙর আর কুমীর আমার দেহ কুরে-কুরে খাবে। কিন্তু সে তো কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার। সারা জীবন ধরে এমন করে তোমার দাপটে নিজেকে শেষ করে দেয়ার চেয়ে সমুদ্রের জলে নিশ্চিন্ত মৃত্যুকে বরণ করে নেয়া আমার পক্ষে অনেক ভাল।

কোথায় আছে সেকথা ভুলে গিয়ে চিৎকার করে ওঠে অবনী ঘোষাল, তুমি জান আমার জীবনে কোন হেঁয়ালির স্থান নেই। কি হয়েছে ঠিক করে বল?

এখনও কিছু হয় নি, একটু থেমে সুরমা উত্তর দেয়, তবে যে কোন মুহূর্তেই হতে পারে।

সোজা ভাষায় বল কি হতে পারে?

সব কিছুই, সুরমাও হয়তো স্থানকালের কথা ভুলে যায়, যা এতদিন আমার কাছে অসম্ভব মনে হত—আজ তাও সম্ভব হতে পারে—

সোজা ভাষায় কথা বলতে জান না?

তোমাকে সামনে দেখলেই আমার চোখের সামনে আজকাল সব কিছু বাঁকা হয়ে যায়।

দেখ, শাসন আর আদেশ যেন এক হয়ে মিশে যায় অবনী ঘোষালের গলার স্বরে, আমি জানি তোমার মতো মেয়েকে কেমন করে সোজা করতে হয়—

জানলেও—হাসির আমেজ ছড়িয়ে-ছড়িয়ে কথা বলে সুরমা, এবার বোধহয় তোমাকে সে-কৌশল ভুলে যেতে হবে।

বিলেতে গিয়ে আর কিছু শিখতে পার নি না? শুধু কেমন করে ঘর ভাঙতে হয় সে-কায়দাটুকুই শিখে এসেছ?

জিজ্ঞেস করতে পারি তুমি কি শিখে এলে?

দেশে ফিরে তার প্রমাণ পাবে।

তখন আমিও আমার শক্তির প্রমাণ দেব।

আর নয়। আর দাঁড়িয়ে থাকা যাবে না। শোনা যায় না। ঘৃণায় বুকের ভেতর রী রী করে ওঠে। এবার এখান থেকে সরে যেতে হবে। সুরমার ওপর ঘৃণা নয়—অবনী ঘোষালের ওপরও নয়—যে-নিয়ম মনকে গুটিয়ে গুটিয়ে একটা মাছির মতো ছোট করে তুলেছে সে-নিয়ম চুরমার করে দেয়ার ইচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে বিপাশার মনে।

আর ঠিক তখন এক নতুন রূপ নিয়ে সমুদ্র গর্জন করতে থাকে তার সামনে। সুরমা আর অবনী ঘোষালের কেবিনের পাশ থেকে অনেক দূরে চলে যায় বিপাশা। জাহাজের একেবারে সামনের দিকে এসে দাঁড়ায়। দশটা কি এগারোটা বেজেছে তখন। ঠিক জানে না বিপাশা। ঘড়ি নেই তার হাতে। কয়েক দিন হল তার ছোট পুরনো ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে। হোক। ভালই হয়েছে। সময় জানবার কোন আগ্রহ নেই তার। একা-একা এদিকে এসে সুরমা আর অবনী ঘোষালের কথাই ভাবতে চেয়েছিল সে—আর সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের কথাও।

হ্যাঁ, ওই স্বামী-স্ত্রীর কথা কাটাকাটি শুনতে শুনতে পুরনো জীবনের

কথাই মনে পড়ছিল বিপাশার। অবনী ঘোষালের মধ্যে সে যেন অসিতকেই আবিষ্কার করতে পেরেছিল। আর ঠিক তখনই সে সরে যায় সেখান থেকে।

একটা তীব্র অস্বস্তি মনে দানা বাঁধলেও তৃপ্তির মিঠে স্বাদও যেন মিশেছিল তার মধ্যে। আগুন লেগেছে সুরমার মনে। ও জ্বলছে। আর জ্বলতে জ্বলতে অল্প-অল্প করে খুঁজে পাচ্ছে নিজেকে। পাবেই। নিয়মের ডোবা থেকে মাথা তুলে মুক্তির অস্পষ্ট সমুদ্রের স্বাদ পাচ্ছে। ওর রক্তেও আগুনের শিখা কাঁপছে। অকারণেই হয়তো বিপাশা নিজেই কেঁপে ওঠে একবার। আগুনের জ্বলন্ত একটা শিখার মতোই।

বঞ্চনার জাল যেমন রূপ নিয়ে ঝলসে উঠুক—রঙে রঙে যতই চমক লাগাক—কঠিন নিয়মের সাত-পাঁচ দিয়ে বেঁধে রাখুক আজকের মানুষকে—একদিন না একদিন প্রত্যেকে তা কাটবেই। নিয়ম যে জীবনের চেয়ে বড় নয় সেকথা বুঝতে হবেই এই সমাজের প্রত্যেকটি লোককে।

আর তখন অবনী ঘোষালের মতো মানুষ থাকবে না কোথাও। অমর সিং হারিয়ে যাবে। সমর ধরে রাখতে পারবে অলগাকে। গেইল এমন থাকবে না। মনীষারও নতুন জন্ম হবে।

কিন্তু সে কবে!

হঠাৎ আকাশটা একবার দেখে নেয় বিপাশা। নিজের ছায়া দেখে নিটোল মেঘের ভাঁজে-ভাঁজে। সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ-এর রেখায়-রেখায় নিজেকে অনুভব করে। আর একবার ট্যুরিস্ট ক্লাসের দিকে যেতে চায়।

ভবসিন্ধু সুখী হবে সিবিলকে নিয়ে। করিম আর পাঁচু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে-ফেলে দুর্বল হয়ে পড়বে না। ইসমাইলের সব আশঙ্কা দূর হয়ে যাবে।

আর বিপাশা? ভয়ঙ্কর দাহের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে যেদিকে চোখ ফেরাবে সেদিকেই দেখবে নিখুঁত জীবনযাত্রার অদ্ভুত এক ছবি। এক-একটি মানুষ ফুটে উঠেছে এক-একটি তাজা ফুলের মতো। স্বাধীনতার স্বাদে তৃপ্ত। পরিপূর্ণ।

আর একবার ভাবে বিপাশা—সে কবে!

অপরাহ্নের আশ্চর্য গৈরিক রঙ মিশেছে সমুদ্রের জলে। কিন্তু এতটুকু ক্লান্তি নেই সমুদ্রের। নিজের বিশালত্ব নিয়ে যেন দ্বিগুণ বেগে ফুঁসে উঠছে। ভাঙনের উন্মাদ নেশায় বিভোর হয়ে ছুটে আসছে এক-একটি ঢেউ। আর অপরূপ হয়ে ভেঙে যাচ্ছে। রুপোলী আভা ছড়িয়ে-ছড়িয়ে ঝিকমিক করে উঠছে। উদ্দাম হাওয়ার তালে তালে তলোয়ারের মতো ঝলসে উঠছে। কী বিশাল! কী বিরাট।

এমন গর্জন শুনতে শুনতে আর ভয়ঙ্কর শোভা দেখতে দেখতে সমুদ্রের জলে মিলিয়ে যেতে চায় বিপাশা। কারুর কথা মনে থাকে না। যত তুচ্ছ টুকরো-টুকরো ঘটনা গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে কোথায় মিশে যায়।

কিন্তু হঠাৎ চমকে বিপাশা মাথা তুলে দেখে সুরমা এসে তার পাশে নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছে। কেউ দেখতে পায় না কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যে বিরক্তির একটা ছায়া পড়ে তার মুখে। বিরাটের কাছ থেকে এখুনি সুরমা জোর করে বিপাশাকে যেন একটা সংকীর্ণ গণ্ডিতে টেনে আনবে।

সুরমা বলে, আমি আপনাকেই খুঁজছিলাম।

মুখে জোর করে হাসি ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করে বিপাশা বলে, বলুন?

কিছু মনে করবেন না, সামান্য ভূমিকা করে সুরমা বলে, একটা কথা কি জিজ্ঞেস করতে পারি আপনাকে?

সমুদ্রের দিকে চোখ ফিরিয়ে বিপাশা আর একবার বলে, বলুন?

এখন কিন্তু ইতস্তত করে সুরমা। বিপাশার আর একটু কাছে সরে আসে। একবার এদিক-ওদিক তাকায়। না, কেউ কোথাও নেই। অনেক দূরে আর দুটো জাহাজ চলেছে পাশাপাশি। আর কয়েক মুহূর্ত পরেই যেন দিগন্তের কোলে মিশে যাবে। ঘন কালো

ধোঁয়া আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে উঠছে—ভিজে উঠছে ঢেউ-এর ঝাপটায়।

আপনার কোন দুঃখ নেই? সুরমা জিজ্ঞেস করে।

কিসের দুঃখ?

ঘর ছেড়ে চলে আসবার।

বাতাসের ভয়ঙ্কর শব্দ। সমুদ্রের বিপুল গর্জন। আকাশ হঠাৎ যেন অনেক বড় হয়ে উঠেছে। কর্কশ স্বরে ডাকতে-ডাকতে জাহাজের ওপর দিয়ে একটা পাখি উড়ে যায়। সুরমার প্রশ্ন শুনে বিপাশার শরীরটা হঠাৎ যেন কুঁকড়ে যায়।

দেখুন, দেখুন—দূরে একটা পাহাড়ে ঢেউ-এর দিকে আঙুল দেখিয়ে বিপাশা বলে, কত বড় ঢেউ!

আপনার কখনও মনে হয় না যে আপনি ভুল করেছেন? ক্ষীণ স্বরে জিজ্ঞেস করে সুরমা।

সমুদ্রের বিশালত্ব রক্তের মধ্যে অনুভব করতে করতে বিপাশা শুনতে চায় না সুরমার প্রশ্ন। ওকে ছোট তুচ্ছ একটা পোকার মতো মনে হয়। এই জাহাজটা সমস্ত যাত্রী নিয়ে এই মুহূর্তে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ুক। সমুদ্রের আলোড়ন জাগুক বুকে। ঢেউএর পর ঢেউ এসে সংকীর্ণ জীবনের তুচ্ছ প্রশ্নগুলিকে চুরমার করে দিক। জলে ভাসতে-ভাসতে এক-একটি দেহ গিয়ে মিশুক দূরের দিগন্তে। হারিয়ে যাক।

তবু সুরমার কথার ছোট উত্তর দেয় বিপাশা, না!

আবার সুরমা জিজ্ঞেস করে, আর কখনও কোন অসুবিধা হয় নি আপনার?

কিসের অসুবিধা?

একা-একা দিন কাটাবার?

না।

পাঁচজন বিদ্রূপ করে নি?

তাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক আমার নেই।

দেখুন, আকাশের দিকে একবার তাকায় সুরমা। একবার সমুদ্রের দিকে। কি যেন ভাবে মনে মনে। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর মাথা নিচু করে জল দেখতে দেখতেই বলে, কিছু মনে করবেন না। আপনাকে একটা কথা বলি—আমি আর পারছি না—

কি পারছেন না? সুরমা কি বলতে চায় বুঝতে পারলেও কিছু না বোঝার ভান করে বিপাশা।

মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়, সুরমার গলার স্বর হঠাৎ ভারী হয়ে ওঠে, সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি—

কেন?

বিপাশার প্রশ্নের উত্তর ইচ্ছে করেই এড়িয়ে যায় সুরমা, এমন করে সমুদ্র দেখবার মতো চোখ আমার কখনও ছিল না জানেন? এখন হঠাৎ যেন একটা বন্ধ দরজা খুলে গেছে—

সুরমার দিকে তাকিয়ে বিপাশা বলে, তাহলে মরতে চান কেন?

এমন করে আর বাঁচতে পারি না!

বিপাশা ভেবেছিল আর পাঁচজন মেয়ের মতো সুরমা নিজের দৈন্যের কথা গোপন করে যাবে। একে-একে বানিয়ে-বানিয়ে তার স্বামীর অনেক গুণের কথা জাহির করে চলবে যতবার তার সঙ্গে দেখা হবে ততবার। আর সুযোগ পেলেই বিপাশার কথা তুলে তাকে বোঝাবে যে সে ভুল করেছে। যে-কোন কারণেই হোক, মেয়েদের কখনও সংসার ছেড়ে বেরিয়ে আসা উচিত নয়।

তাই আজ প্রায় রাতারাতি সুরমার আশ্চর্য পরিবর্তন দেখে বিপাশা অবাক হয়ে গেল। এখন তাকেও যেন সমুদ্রের মতো মনে হচ্ছে। যদিও ঠিক এই মুহূর্তে আর কোন কথা বলছে না সুরমা কিন্তু ভয়ঙ্কর উত্তেজনায় তার দেহ থরথর করে কাঁপছে। কি কথা বলে তাকে এখন সান্ত্বনা দেবে বিপাশা!

না, বিপাশা দৃঢ় স্বরে বলে সুরমাকে, মরবার কথা ভেবে কখনও নিজেকে ছোট করে তুলবেন না।

কি করব আপনি বলে দিতে পারেন?

হঠাৎ হেসে উঠে বিপাশা বলে, একটু ঝগড়া হলে এমন করে কি বিচলিত হতে হয়?

একদিনের ঝগড়ায় আমি কখনও বিচলিত হই নি। দিনের পর দিন আমার সব কিছু হরণ করে আর একজনের অন্যায় প্রভুত্ব আমি সহ্য করতে পারছি না—পারব না।

কিন্তু এতদিন তো সহ্য করলেন?

হ্যাঁ, করেছি, কঠিন স্বরে সুরমা বলে, এতদিন আমি নিজের কথা ভেবে দেখবার সুযোগ পাই নি—একটু থেমে সে আবার বলে, আর আপনার সঙ্গেও আমার আলাপ হয় নি—

বিপাশা চমকে ওঠে, তার মানে?

কোন দ্বিধা না করে সুরমা উত্তর দেয়, প্রতিবাদ জানাবার যে-ভয় আমার ছিল এতদিন—আপনাকে দেখবার পর সে-ভয় আমার একেবারেই ভেঙে গেছে।

বিপাশা চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করে, কিন্তু কেন? আমার সম্বন্ধে আপনি তো এখনও কিছুই জানেন না?

না। আমার আর কিছু জানবার দরকারও নেই। কিন্তু আপনি যে আমার চেয়ে অনেক সুখী সেকথা বুঝেছি বলেই এখন আমি আপনার সঙ্গে কথা বলবার জন্যে ছুটে এসেছি।

কয়েক মিনিট কি ভাবে বিপাশা। সুরমাকে হঠাৎ কি বলবে ঠিক করতে পারে না। কিন্তু যে-জগৎ থেকে সে সরে এসেছে অনেক দূরে—এখন সেখানকার হাওয়ার ঈষৎ কম্পন অনুভব করলেও তার অস্বস্তি বোধ হয়। আর স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারে কোন মতামত জানাবার প্রবৃত্তিও তার হয় না। এখন তার কাছ থেকে সুরমা চলে গেলেই সে খুশি হয়। কিন্তু একটা কিছু বলতে তো হবেই তাকে।

নিজের গলার স্বর অদ্ভুত হয়ে ওঠে বিপাশার। থেমে থেমে সে সুরমাকে বলে, আমার সঙ্গে আলাপ হয়ে আপনার কি লাভ হয়েছে জানি না, কিন্তু বোধহয় আমার সম্বন্ধে একটু ভুল বুঝেছেন—

সুরমা যেন আপন মনেই প্রশ্ন করে, ভুল?

হ্যাঁ, জোর দিয়ে বিপাশা বলে, আপনি ভুলই করেছেন। কারণ আমার স্বামীর কোন ব্যাপারে আমি কখনও প্রতিবাদ জানাই নি আর তার বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগও নেই। কোন অন্যায়ের জন্যে তার সঙ্গে আমার গোলমাল হয় নি—

গোলমাল হল কেন?

বিপাশা হেসে বলে, হয় নি তো।

তাহলে?

আমি তো বললাম যে আপনি একটু ভুল করেছেন। আর এখনও বলছি আমাকে দেখে আপনি আপনার নিজের জীবন নিয়ে কোন কিছু করতে যাবেন না—অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বিপাশা বলে, একটা কিছু গড়ে তোলা হয়তো সহজ কিন্তু ভাঙা বড় কঠিন। মনের ফাঁকে-ফাঁকে জীবনের যে ভাঙাচোরা টুকরোগুলো বিঁধে থাকে তা বোধহয় মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত যন্ত্রণা দেয়।

তোতাপাখির মতো সুরমা জিজ্ঞেস করে, স্বামীর কথা ভেবে আপনার এখনও কষ্ট হয় বুঝি?

সুরমার এ-প্রশ্ন ভাল লাগে না বিপাশার। তার স্থূল জিজ্ঞাসার উত্তরে সে শুধু বলে, না। সেসব কোন কথা আমার মনেই পড়ে না।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে গলার স্বর খুব নামিয়ে সুরমা জিজ্ঞেস করে, আপনি বুঝি আর কাউকে ভালবেসেছিলেন?

তার কৌতূহল দেখে হাসে বিপাশা। এখন একটা-একটা করে সুরমাকে সব কথা শোনাতে হবে। কিন্তু শোনাবার আছে কি! বিপাশার যে-মন তাকে ঘর ছাড়া করেছে—সমুদ্রের যে-গর্জন ঘরের

দেয়াল চুরমার করে তার কানে গিয়ে পৌঁছেছিল—সেকথা সুরমাকে কেমন করে বলবে বিপাশা। বলতে তার ইচ্ছেও নেই।

সে শুধু সুরমার প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দেয়, না, আমি আর কাউকে ভালবাসি নি।

বিস্ময়ের কয়েকটা রেখা ফুটে ওঠে সুরমার কপালে। আর হয়তো ঠিক সেই মুহূর্তে সে নিজের সুখদুঃখ আর দ্বন্দ্বের কথাও ভুলে যায়। কোন কথা না বলে সে বিপাশার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। কিন্তু তবু তখনও সমুদ্রের দিকেই চোখ বিপাশার।

কিন্তু তাহলে আপনি কেন—

সে-কারণের কথা আমি আপনাকে বলতে পারব না, বাধা দিয়ে বিপাশা বলে।

আর তার কথা শুনে লজ্জা পায় সুরমা। তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, কিছু মনে করবেন না—আমি নিজে সাহস পাবার জন্যেই আপনাকে এ-প্রশ্ন করলাম—

দেখুন, একটু নরম সুরে বিপাশা বলে, কাউকে অনুকরণ করে কোন মহৎ কিছু পাওয়া যায় না। আপনি আপনার মন আগে ভাল করে জানুন। তারপর মন যা চাইবে তাই করবেন—কোন সংশয় নিয়ে কখনও কিছু করতে যাবেন না।

হঠাৎ সুরমার চেহারায় একটা আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য করে বিপাশা। জোরে-জোরে নিশ্বাস পড়ছে তার। ত্রস্ত উত্তেজনায় সে অস্বস্তি বোধ করছে। সমুদ্রের দিকে ঝুঁকে পড়ে যেন নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চাইছে।

কি হল আপনার? প্রশ্ন করেই বিপাশা বুঝতে পারে কেন সুরমার এই আকস্মিক পরিবর্তন। দূর থেকে তার দিকে নিষ্ঠুর দৃষ্টি দিচ্ছে অবনী ঘোষাল। একটু-একটু করে এগিয়ে আসছে। বোধহয় বিপাশা তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে বলে অভদ্রের মতো সুরমাকে আক্রমণ করতে সঙ্কোচ করছে। তখন বিপাশা নিজেই কি একটা ছল করে সেখান থেকে সরে যায়।

আজ নাচের ঘরে অনেকক্ষণ ধরে নাচ হবে। এখানে-ওখানে বিজ্ঞাপন পড়েছে। বিজ্ঞাপন মানে বড় বড় কালো বোর্ডে চক দিয়ে লেখা হয়েছে সান্ধ্য নাচের কথা এবং বিশেষভাবে প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

হয়তো বিপাশা আজও যেত নাচের ঘরে। স্কোয়াশের গেলাস নিয়ে চুপচাপ বসে থাকত একদিকে। তারপর একসময় হয়তো ইংগে আর অমর সিং এসে বসত তার কাছে। আর দ্রুত ছন্দের উদ্দাম গতিতে কিছুক্ষণ বিভোর হয়ে থাকত বিপাশা। আযোজন ছড়ানো প্রবঞ্চনার জালটা মিলিয়ে যেত তার চোখের সামনে থেকে। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে নেশার ঘোরে সব কিছু ভুলে যেতে ইচ্ছে করে তার। এই বিস্মৃতি যেন তার মনের ক্ষণিক বিশ্রাম।

কিন্তু আজ ইচ্ছে করেই বিপাশা গেল না নাচের ঘরের দিকে। যাবার দরকারও নেই। এখন ডেক একেবারে নির্জন। সমুদ্রের ওপর নিঃশব্দে অন্ধকার নামছে। হাওয়ায় ঠাণ্ডার আমেজ আছে। হঠাৎ একবার হাওয়ার ঝাপটায় শিউরে ওঠে বিপাশা।

জাহাজের সব আলো জ্বলে উঠেছে এর মধ্যেই। চারপাশ একেবারে ফাঁকা। কাউকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। বোধহয় কোন প্রয়োজন হবে না বলে একজনও স্টুয়ার্ডেস আসছে না এখন এদিকে। যাক্, এখন নিশ্চিন্ত হয়ে অনেকক্ষণের জন্যে নিজের মনটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে পারবে বিপাশা।

আস্তে একটা ডেক-চেয়ার টেনে রেলিঙের ধারে এনে সে বসে পড়ে। কপালে একবার হাত বুলিয়ে নেয়। কপাল ছুঁয়ে একা-একা ভাবপ্রবণ হয়ে ওঠবার জন্যে নয়—এটা ওর অনেকদিনের অভ্যাস। অনেক সময় দুই হাতে নিজের চোখ দুটোও চেপে বসে থাকে বিপাশা।

আর তখনই সে যেন তারই নিজের মন আর মূর্তি স্পষ্ট দেখতে পায়। থরো থরো একটা আবেগ, পুঞ্জ পুঞ্জ বেদনা, রুদ্ধ আক্রোশের ধকধক দুঃসহ যন্ত্রণা তাকে সত্যি একেবারে অবশ করে রাখে। নিঃসঙ্গ

মুহূর্তগুলো ভয়ের পাখায় ভর করে যেন আসে। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে বিপাশা ভয় পায়—পরাজয়ের গ্লানিতে ফুলে ওঠা ঠাণ্ডা ভয়। তখন পায়ের কাছে কোন সরীসৃপ যেন শিরশির করে ওঠে। কনকন করে ওঠে শরীর। কান দুটো তপ্ত ভাব ছড়াতে থাকে।

কি একটা খোঁজে বিপাশা তখন। কাকে যেন নিবিড় করে আঁকড়ে ধরতে চায়। ভয় দূর করে দেয়ার ব্যাকুল আগ্রহ কয়েক মুহূর্তের জন্যে তাকে তার শপথ ভুলিয়ে দেয়। মনে হয়, সমাজের চালু নিয়ম মেনে চলতে পারলেই সে যেন সুখী হতে পারত।

কিন্তু ভুয়ো আরামের দিকে হঠাৎ কেন তার এই ঝোঁক—সমুদ্রের শোভা দেখতে দেখতে কেন তার এই শর্ত বহুল আত্মসমর্পণের ভীরু করুণ মানসিক বিলাস! আসলে শপথটা কি বিপাশার জীবনে ?

সংকীর্ণ গণ্ডির তুচ্ছ সুখ দুঃখ এড়িয়ে সে মুক্তি চেয়েছিল। নিজেকে রেণু-রেণু করে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিল এই পৃথিবীর অজস্রতায়। কোন একজন বিশেষ মানুষের হাতে সে তুলে দিতে চায় নি তার সমস্ত জীবন। ছোট একটা সংসারকে বিশাল পৃথিবী মনে করে সুখী হতে পারে নি। অসিতের সংসারে এসেই সেকথাটা বুঝতে পেরেছিল বিপাশা।

কিন্তু যাদু ছিল অসিতের চোখে প্রথম-প্রথম। আর মোহর আমেজও ছিল বিপাশার ভাবনা-চিন্তায়। কিন্তু সে-বিলাসের আয়ু কতক্ষণ! কেমন করে সে ছোট মেয়ের মতো নিজেকে ভুলিয়ে রাখবে সংসারের নানা খেলনা দিয়ে আর স্বামীর মিষ্টি কথায়। রঙীন স্বার্থ দিয়ে ঢাকা কথার ফুলঝুরি কতদিন তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখবে! ছোট ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হবে মহাজগতে। কিন্তু একটা অবলম্বন না হলে ঘর ছাড়া যায় না—স্বামীকে ছাড়া যায় না।

ইতিহাসের পাতা তখন জীবন্ত হয়ে উঠত বিপাশার চোখের সামনে। রাজবধূ মীরা তাকে ডাকত—স্বপ্নঘোরে তাকে দেখাত অনেক দূরের পথ। সে-ডাকে মনে মনে সাড়া দিলেও এই পৃথিবীর অসংখ্য

মানুষের কাছ থেকে নিজেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে নিতে মন চাইত না বিপাশার। আর তখনই সে দেখত মুক্তিরই এক ধোঁয়া-ধোঁয়া ছবি। যেন বন্ধনের বিষ রূঢ় হাতে মুছে দিতে পারলেই গোটা পৃথিবীটা চলে আসবে তার খুব কাছে—আত্মার আত্মীয়ার মতো। তখন নিজের মধ্যেই সে অনুভব করবে এক মহাজীবন।

তারপর বিলেতের কয়েকটা হালকা চপল রূঢ় গম্ভীর বছর। ব্রজকিশোরবাবুকে সব কথা বলতে পারে নি বিপাশা। বললেও তিনি হয়তো বুঝতে পারতেন না তার কথা। নিজেকে এক কঠিন পরীক্ষার সামনে ফেলবার জন্যেই সে হাজার-হাজার মাইল দূরে সরে এসেছিল।

এক নতুন দেশ আর অসংখ্য নতুন মানুষ। কথাবার্তা চালচলন দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নতুন-নতুন তো বটেই। দেশ এখন আর বড় নয় বিপাশার কাছে। মানুষ বড়—জীবন বড়। অসিতের কথা ভেবে সে অনুতাপ করে না। বাবার কথা ভেবে ভাবপ্রবণ হয়ে ওঠে না।

পাঁচজন যদি তাকে নিষ্ঠুর বলে মনে করে—করুক। মহাজীবনের চেয়ে তার কাছে বড় কেউ নয়—কিছু নয়। কিন্তু সে-মহাজীবনের সংজ্ঞার্থ কি? কে তাকে হাতছানি দিল? কে তাকে ধর্মের শাসন তুচ্ছ করতে শেখাল? কোন বিদ্রোহী তাকে সাহস দিল—আশ্বাস দিল? কি তার নাম?

বিপাশা জানে না। দিনরাতের তিল-তিল যন্ত্রণায় হাজার নিয়মের বিরুদ্ধে সে যেন এক জ্বলন্ত প্রতিবাদ। ভাবের ঘরে আশ্রয় নিয়ে সে ভগবানের আরাধনা করতে চায় না। কিন্তু প্রেমের যে-রূপ খণ্ড খণ্ড করে মানুষের জীবনকে—সব স্বাধীনতা হরণ করে নিয়মের দোহাই দিয়ে—সে-প্রেমে আস্থা নেই বিপাশার।

সেকথাটা দুঃসাহসীর মতো স্বীকার করতে পেরেছে বলেই আজ সে ঘরছাড়া। আজকের সমাজে যে-প্রেম নিবিড় এক ভাবপ্রবণতায় মানুষকে স্বার্থপর করে তোলে—আপামর জনসাধারণের কাছ থেকে টেনে নিয়ে মেকী সোনার শিকলে বেঁধে অন্ধ করে রাখে—কাঁদায় আর

ঈর্ষাকাতর করে তোলে—সে-নকল প্রেমের কবল থেকে সে খুব সহজেই মুক্ত হতে পেরেছে বলে তার খুশি হওয়াই তো স্বাভাবিক।

কিন্তু খুশি কেন হতে পারে না বিপাশা। কেন থেকে থেকে সে ভয় পায়? কেন মাঝে মাঝে হারের বিপুল গ্লানি তার সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে দিতে চায়! কেন? কেন! সমুদ্র গর্জনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মনে মনে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে বিপাশা। আর তখনই একটি মানুষকে দেখতে চায় চোখের সামনে—যে ঠিক তার মনের মতো।

কিন্তু যে-পরিবারের মেয়ে বিপাশা সেখানে তার এই কাজের সমর্থন নেই। এটা স্বার্থপরেরই কাজ। এবং এর বদলে তার কপালে জুটবে শুধু দুর্নাম। বিদেশে পাড়ি দেবার আগে ব্রজকিশোরবাবু তাকে বলেছিলেন, অসিতের যদি কোন দোষ থাকত তাহলে আমি তোকে কিছু বলতাম না—কিন্তু অকারণে কেন তুই আমাদের বংশে এত বড় কলঙ্ক লেপে দিতে চাস?

কলঙ্ক? বিস্ময়ের অস্ফুট একটা ধ্বনি বেরিয়েছিল বিপাশার মুখ থেকে। যদি আর কেউ তাকে একথা বলত তাহলে সে নিশ্চয়ই চমকে উঠত না, কিন্তু যে-বাবা তাঁর কাছে ছিলেন এতদিন অসাধারণ এক রূপ নিয়ে, আজ কেন তিনি এত বিচলিত হয়ে এমন সাধারণ হয়ে উঠতে পারলেন!

কিন্তু সেদিন বিপাশা বুঝেছিল তার শেষ টানটাও মুছে গেল বুক থেকে। এখন দূর থেকে আরও দূরে চলে যেতে তার আর কোন দ্বিধা নেই। যশ অপযশ মান অপমান আর কলঙ্ক—এ-সমাজের মানুষের দেয়া কোন কিছুই আর কোন অনুভূতি জাগাবে না তার মনে।

কিন্তু যখন সে সত্যিই নতুন দেশে চলে এল আর দেখল প্রকৃতির আর এক রূপ তখন বিদেশী মানুষের সভ্যতার ভানেও সে মুগ্ধ হয়েছিল। যেন জীবন এখানে অনেক বেশি স্বাধীন—অনেক বেশি ব্যাপক।

কৌতূহল আর সমালোচনার যত গ্লানি জমা হয়েছিল বিপাশার মনে—এখানে এসে প্রথম-প্রথম যেন তার অনেকখানি লাঘব হল।

হ্যাঁ, স্বাধীন দেশ। এখানে সকলেই সমান। কেউ অকারণ কৌতূহল প্রকাশ করে কাউকে বিব্রত করে না। আর যা সব চেয়ে ভাল লাগল বিপাশার তা হল, মনুষ্যত্বের সম্মান। কারুর ওপর অবহেলা প্রকাশ যেন এদের ধর্ম নয়। বিপাশার পোড়া মন অনেক নরম হয়ে এল।

বাইরের হালকা রোদ্দুর, গন্ধহীন ফুলের ভিড় আর মানুষের দ্রুত চলার ছন্দ প্রথম কিছুদিন তার চোখে নেশার ঘোর নামিয়ে আনল। আর বিপাশা যেন সব ভুলে গেল। এই সমাজটাই হঠাৎ যেন তার কাছে সুন্দর হয়ে উঠল। বন্ধনের রজ্জুও রঙীন মনে হল। আর নিজেকে বিলিয়ে দেবার উগ্র নেশা পেয়ে বসল তাকে।

শরীরটা থেকে থেকে বিদ্রোহ করে ওঠে। ঝিমিয়ে-ঝিমিয়ে একটা বিকট ক্লান্তি এসেছে বিপাশার। প্রকৃতির যাদুতে যেন আগুন লাগে তার রোমকূপে। তখন মনে মনে সে উগ্র বন্য হয়ে ওঠে। ক্ষুধার্ত চোখে তাকায় এদিক-ওদিক।

সমাজ-বিজ্ঞানের ক্লাস করতে করতে বিপাশা চঞ্চল হয়ে ওঠে। সব বোধ যেন তার লুপ্ত হয়ে গেছে। কামনার ভয়ঙ্কর একটা আগুন তাকে পুড়িয়ে মারে সারাদিন। এই আবরণ, সভ্যতা আর কৃত্রিম লৌকিকতা তাকে যেন পাগল করে দেয়।

এখানকার দরিদ্র মানুষের দিকে তাকিয়ে বিপাশার মনে হয়, অর্থনৈতিক যন্ত্রণা থেকে যেন পৃথিবীর মুক্তি এসে গেছে। সব ভান আর প্রবঞ্চনার কঠিন মুখোশ টুকরো-টুকরো হয়ে ধূলোয় লুটোচ্ছে। অর্থনৈতিক মুক্তির একটা সুর সে শুনেছে বিদেশের জলে আর হাওয়ায়। আর বার বার তার মনে হয়েছে যে বাইরের অভাবের যন্ত্রণা কিছু নয়।

কিন্তু কবে মানুষের সমাজ থেকে সভ্যতার ভানের আরও একটা কঠিন আবরণ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে—কবে মনের যন্ত্রণা চেপে উন্মাদের মতো ঘুরে বেড়াবে না মানুষ! বুনো একটা ভাব চারপাশে জারিয়ে গিয়ে মানুষকে সুস্থ সবল করে তুলবে!

নিজে ভুগছে বলেই এখন বিপাশা সেকথাটা স্পষ্ট করে বুঝতে পারছে। কেবলই নিয়ম আর নিয়ম। যদি অল্পক্ষণের জন্যে কাউকে নিবিড় করে পেতে ইচ্ছে করে তাহলে জীবনীশক্তি ক্ষয় করেও সে-ইচ্ছেকে দমন করে রাখতে হবে। না হলে লোকনিন্দার ভারে জর্জরিত হতে হবে। প্রাণের সত্যি কথাটা স্পষ্ট ভাষায় জানাতে গেলেই তার নাম দেবে মানুষ, ব্যভিচার।

ইংল্যাণ্ডে আসবার পর-পর সে-দেশের আলো আর ঘ্রাণের তীব্র নেশার একটা স্বাদ পেয়েছিল বিপাশা। সজাগ ইন্দ্রিয়কে শ্রদ্ধা জানাতে চেয়েছিল অকৃপণ উপভোগে। জীবনের দৈনন্দিন দাবীকে সে অস্বীকার করতে চায় নি।

আজকের বন্ধনে তার বিশ্বাস নেই—না থাক। কিন্তু উপভোগে তার আস্থা থাকবে না কেন! দেহের দাবীকে অস্বীকার করে তিল-তিল যন্ত্রণায় সে নিজেকে ক্ষয় করবে কেন! কেউ এসে দাঁড়াক তার পাশে। তাকে সম্মোহিত করুক—শান্ত করুক। মনের ভয়ঙ্কর আগুনটা নিবিয়ে দিক।

যে এল সে-সময় বিপাশার মন-পোড়ানো আর জীবনীশক্তি ক্ষয় করা ভয়ঙ্কর আগুন নিবিয়ে দিতে তার নাম ফ্র্যাঙ্ক। একই হোটেলে থাকে বিপাশার সঙ্গে। পাশাপাশি ঘরে। বোধহয় ইংল্যাণ্ডেরই কোন গ্রামে তার বাড়ি। কি একটা চাকরি করে লণ্ডনে—বিপাশা ঠিক খবর রাখে না। খবর রাখবার দরকারও নেই। বুনো আদিম একটা উল্লাসে সে তখন বিভোর। যদিও সমাজের বিচারে তার এই মনোভাবের নাম লালসা—কিন্তু লালসা কার মনে নেই? এদেশে না এলে হয়তো বিপাশা নিজেই তার এই আদিম রূপ প্রকাশ করবার মনের জোর পেত না। আর গুমরে-গুমরে নিজের মনটাকেই পিষে মারত।

কিন্তু ভুল করেছিল বিপাশা। ফ্র্যাঙ্ক তার স্বামী অসিতের মতোই। সেও আজকের সভ্যতার ভানে পরাজিত নিরীহ একটা মানুষ। বিভিন্ন পরিবেশে বাইরের রূপের কিছু প্রভেদ চোখে পড়ে বটে কিন্তু

ভেতরে-ভেতরে সকলেই এক। সেকথাটা খুব অল্পদিনের মধ্যেই বুঝে নিতে পেরেছিল বিপাশা।

নতুন দেশের বাইরের চাকচিক্য হঠাৎ একসময় তার চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল। তখন এ দেশেও সে চিনতে পারল ধনী আর দরিদ্রকে। প্রবঞ্চনা করবার মার্জিত রীতিটাও তার অজানা রইল না। এবং এদের বাইরের যে ভদ্রতা আর বিনয় কিছুদিনের জন্যে সব গ্লানি আর যন্ত্রণা দূর করে দিয়েছিল বিপাশার—ভেতরের বীভৎস রূপ আবার তাকে কঠোর গম্ভীর করে তুলল।

যদিও আজকের কোন মানুষের কাছ থেকে শ্রদ্ধার তিলমাত্র বিপাশা আশা করে নি তবুও সে ভেবেছিল অন্তত এদেশে একটি মাত্র মানুষও তাকে এক নতুন পৃথিবীর সন্ধান দেবে—এক হয়ে মিশে যাবে তার ভাবনা-চিন্তায় রক্তে-রক্তে নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে। আর তখন সে-ও তার চলার সঠিক পথটা চিনে নিতে পারবে। একটি মাত্র মানুষের কাছেই মন খুলে তার দারুণ মানসিক বিপ্লবের কথাটা জানাতে পারবে।

হয়তো বিদেশী বলেই ফ্র্যাঙ্কের ওপর বিপাশার ধারণা অন্যরকম ছিল। মানুষ হিসেবে সে কেমন হবে—বিপাশার সঙ্গে তার মতের মিল হবে কিনা সেকথা ভেবে সে আগে থেকে কোন স্বপ্ন দেখে নি। কারণ জীবনের সূক্ষ্ম একটা দিক নিয়ে স্বপ্ন দেখবার ক্ষীণতম ইচ্ছেও তার আর নেই। তবুও সে ভেবেছিল এদেশের মানুষ বলে ফ্র্যাঙ্ক অন্তত তাকে তার এই ভাবনা-চিন্তার জন্যে শুধু স্থূল আর ভোগী বলে অবহেলা করবে না। তার তেজ আর সাহসের জন্যে হয়তো তাকে প্রশংসাই করবে।

নাচের ঘর থেকে বাজনার শব্দ আসছে। একজন স্টুয়ার্ডেস দ্রুত পায়ে হেঁটে আসছে এদিকে। রুপোর পাতের মতো চিকচিক করছে উত্তাল সমুদ্রের জল। আজও তারা ফুটেছে আকাশে। নিজের কথা ভাবতে ভাবতে বিপাশা যেন ভুলেই গিয়েছিল যে সে জাহাজে আছে।

আর মোটে তিন-চারদিন। তারপরই ভারতবর্ষ। ব্রজকিশোরবাবুর

কাছেই প্রথমে গিয়ে উঠবে সে। হয়তো যেত না কিন্তু তিনি নিজেই তাকে সেখানে যেতে লিখেছেন। তাঁর শরীরটা নাকি খুব খারাপ হয়েছে। আর কতদিন বেঁচে থাকেন ঠিক নেই।

বাবার গম্ভীর থমথমে মুখটা ভেসে ওঠে বিপাশার চোখের সামনে। থেকে থেকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলবেন তিনি। অসিতের প্রসঙ্গ তুলবেন মাঝে মাঝে। আর হয়তো এখনও একটা মিটমাটের আশা রাখবেন। বিপাশাকে নানা কথা বোঝাবেন। তখন বাবার কাছে সহজ হয়ে উঠতে পারবে না সে। একটা চাকরি নিয়ে যত তাড়াতাড়ি হয় কলকাতার বাইরে চলে যাবার চেষ্টা করবে।

অনেক দূরে—বিপাশা চোখ তুলে একবার দেখে নেয়—ডেকের একেবারে অন্য প্রান্তে ছায়ার মতো একটা মূর্তি এসে দাঁড়ায়। এখান থেকে ঠিক বোঝা যায় না যে সে কে। যেই হোক, নিজের সঙ্গেই কথা বলবে বিপাশা। অন্য কারুর সঙ্গে কথা বলবার কোন ইচ্ছে তার এখন নেই।

ফ্র্যাঙ্ক জিজ্ঞেস করেছিল একদিন, মানুষের হৃদয়াবেগের কোন মূল্য তোমার কাছে নেই কেন?

ঘন সবুজ ঘাসে ভরা লণ্ডনের বনেদী অঞ্চলের একটা পার্কে গ্রীষ্মের এক অপরাহ্ণে বিপাশা গুম হয়ে বসে ছিল কয়েক মিনিট। তারপর থেমে থেমে বলেছিল, তোমার এ ধারণা হঠাৎ হল কেন?

সিগ্রেটে মৃদু একটা টান দিয়ে ফ্র্যাঙ্ক বলেছিল, তোমার কথাবার্তা শুনে—একটু চুপ করে থেকে আবার বলেছিল, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমি যতদূর জানি তাতে মনে হয় তোমার মতো মেয়ে সেখানে খুব বেশি দেখা যায় না—

আর এখানে? নীরস জিজ্ঞাসা বিপাশার।

এখানে আছে বটে, কিছুক্ষণ ইতস্তত করেছিল ফ্র্যাঙ্ক, কিন্তু সব দেশের সব মেয়েই একদিন না একদিন বিয়ের স্বপ্ন দেখে—ঘর বাঁধতে চায়—

উষ্ণ স্বর বেরিয়ে এসেছিল বিপাশার গলা চিরে, হৃদয়াবেগের মূল্য আমি দিই কিনা সেকথা তোমায় বোঝাতে পারব না, তবে ঘর বাঁধবার কোন ইচ্ছে যে আমার নেই সেকথা ঠিক।

কি তোমার ইচ্ছে? অন্তরঙ্গতার সুরই কেঁপেছিল ফ্র্যাঙ্কের গলায়।

ঝাঁজের সঙ্গে বিপাশা বলেছিল, আগুনকে আমি আগুন বলেই শ্রদ্ধা করতে চাই।

তোমার কথা বুঝলাম না।

তোমাদের ঘরের ওপর আমার কোন শ্রদ্ধা নেই।

কারণ তুমি ভয়ানক রকম অসামাজিক।

হ্যাঁ, আমি তাই। কোন প্রবঞ্চনার জালে—তার রঙ যেমনই হোক, আমি আর কিছুতেই জড়িয়ে পড়ব না।

কিন্তু সংসারের শ্রী তুমি অস্বীকার করতে চাও কেমন করে? মানুষের প্রেম কি সুন্দর নয়?

সংসারের শ্রী? বেশ জোরে হেসে উঠেছিল বিপাশা, আমার দুর্ভাগ্য সেই শ্রীর সন্ধান আমি পাই নি। আর আমি পাবোও না—পেতে চাইও না—

কেন তোমার এই বিতৃষ্ণা?

আমি ঠকে মরব না ফ্র্যাঙ্ক। আর প্রেম? মানে দুজনের আদিম সমর্পণ—তারপর কঠিন নিয়ম আর সারাজীবনের ক্লান্তি?

ক্লান্তি নয়, সার্থকতা।

সে-জীবন কি সার্থক?

নিশ্চয়ই। তা না হলে রোজ রোজ অসংখ্য মানুষ কেন সে-জীবন মেনে নিচ্ছে?

কারণ নিয়ম ভেঙে সহজে কেউই এ-সমাজের অপ্রিয় হতে চায় না, ফ্র্যাঙ্ককে থামিয়ে দেবার জন্যেই বোধহয় বিপাশা হঠাৎ প্রশ্ন করেছিল, তোমাদের দেশে স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদই বা হয় কেন?

কথাটা যেন আঘাতের মতো বেজেছিল ফ্র্যাঙ্কের কানে, তার একটা বিশেষ কারণ থাকে। শুধু আদিম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্যে কেউই স্বামীর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে না।

আমিও বেরিয়ে পড়ি নি, সব লৌকিকতা ভুলে আরও জোরে কথা বলেছিল বিপাশা, কিন্তু আদিম প্রবৃত্তিকে অস্বীকার করে একটা ভানের মুখোশ পরে ঘুরে বেড়াতে আমি রাজি নই—ঘন ঘন উষ্ণ নিশ্বাস পড়েছিল তার, তুমি আমার সব কথাই জান ফ্র্যাঙ্ক, আমার মনে হয়, তুমি যতই বল, তোমাদের দেশে কিম্বা পৃথিবীর যে কোন জায়গায়, স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদের মূলে এই আদিম প্রবৃত্তিই যে প্রধান হয়ে ওঠে সেকথা তুমি অস্বীকার করতে পার না—

বাধা দিয়ে ফ্র্যাঙ্ক জিজ্ঞেস করেছিল, তার মানে?

মানে, মাঝখানে আর একটি মুখ এসে উঁকি দেয় বলেই তো সাজানো সংসার ভাঙে—আদিম প্রবৃত্তি ছাড়া এর আর কোন ব্যাখ্যা তুমি করতে পার?

যারা ঘর ভাঙে তাদের ওপর আমাদের কোন শ্রদ্ধা নেই—আমরা কেউই এটা চাই না—

কারণ তাহলে তোমাদের স্বার্থে আঘাত লাগে।

শুধু সে-কারণে নয়, যারা সংসারে অসুবিধার সৃষ্টি করে তারা কারুর প্রিয় হতে পারে না।

পারবে কেমন করে? এটা যে সুবিধাবাদীদের যুগ। অসুবিধার সৃষ্টি কেউ ইচ্ছে করে করে না—মনের তাগিদেই করে।

শেষ টান দিয়ে ছোট সিগ্রেটটা দূরে ছুঁড়ে ফেলবার আগে তার থেকে আর একটা ধরিয়ে নিয়েছিল ফ্র্যাঙ্ক, আমি যদি বলি শুধু নিজের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্যে তুমি আমার অনেক অসুবিধার সৃষ্টি করেছ?

কিসের অসুবিধা?

আমার যে মন বলে একটা কিছু আছে তার কোন মূল্য তুমি

দিতে চাও না কেন? বিপাশাকে উত্তর দেবার অবসর না দিয়ে ফ্র্যাঙ্ক নিজেই যেন তার কথাটা বলে দিয়েছিল, কারণ আমি জানি যে একজনকে নিয়ে খুব বেশি দিন তুমি খুশি থাকতে পারবে না।

কেউই পারে না। তুমি ভীরু তাই সেকথা স্বীকার করতে চাও না। আর আমি তো তোমাকে একেবারে প্রথমেই জানিয়ে দিয়েছিলাম যে সংসার, প্রেম—এসবে আমার বিশ্বাস নেই—

তুমি এক ভয়ঙ্কর মেয়ে।

অস্বীকার করব না। তবে শুধু একটা কথা জেনে রাখ ফ্র্যাঙ্ক যে আমাকে নিয়ম-কানুন কিম্বা সমাজের ভয় দেখিয়ে কেউ কখনও বেঁধে রাখতে পারবে না।

কিন্তু শুধু দুর্নামের এত ভারী বোঝা নিয়ে তুমি বেঁচে থাকবে কেমন করে?

সেকথা আমি একাই ভাবব, হাসিমুখেই বলেছিল বিপাশা, আমার মতো ভাবনা তুমি যদি ভাবতে পারতে ফ্র্যাঙ্ক তাহলে তোমার আর আমার মধ্যে কোন তফাত থাকত না—

ফ্র্যাঙ্কও হেসে বলেছিল, চিরকাল যেন তফাত থাকে।

আস্তে আস্তে ওরা দুজন বনেদী অঞ্চলের গ্রীন পার্ক থেকে বেরিয়ে এসেছিল সেদিন। রাস্তায় অনেক মানুষের ভিড়। দীর্ঘকালস্থায়ী গোধুলির কাঁপা-কাঁপা আলো এখনও লেগে আছে বড় বড় বাড়ি আর গাছের মাথায়।

থমকে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েছিল ফ্র্যাঙ্ক।

বিকৃত উচ্চারণে সে ডেকেছিল, বিপাশা!

নিষ্প্রাণ স্বরে বিপাশা উত্তর দিয়েছিল, কি?

আমি ইংরেজ। যখন-তখন মিথ্যা কথা বলে কাউকে প্রবঞ্চনা করতে ভালবাসি না—

একটা কঠিন কথা প্রায় বেরিয়ে আসছিল বিপাশার জিব ঠেলে কিন্তু প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সামলে নিয়ে সে শুধু বলেছিল, তুমি কি বলতে চাও ফ্র্যাঙ্ক?

বলতে চাই যে, তোমার প্রভাব আমি এড়িয়ে চলতে চাই।

একথা বলবার কোন দরকার ছিল না, সহজ ভাবেই বিপাশা উত্তর দিয়েছিল, যাকে তোমরা সম্পর্ক বল তেমন কোন গড়ে ওঠা আত্মীয়তা যে আমি স্বীকার করি না—

কিন্তু আমি স্বীকার করি, ইংরেজের কাঠ-কাঠ সোজা কথা, তোমার সঙ্গে এতদিন মেলামেশা করবার পর—

কোন দায়িত্ব, তাড়াতাড়ি চলতে চলতে বিপাশা বলেছিল, তোমারও নেই—আমারও নেই—

আমার ছিল, পকেট হাতড়ে দেশলাই খুঁজতে খুঁজতে বলেছিল ফ্র্যাঙ্ক, কারণ আমি গ্রামের ছেলে—

পৃথিবীর একটা শ্রেষ্ঠ শহরের বুকে দাঁড়িয়ে সেকথাটা জোর গলায় আর নাই বা জাহির করলে।

তবু প্রগাঢ় অনুকম্পায় ফ্র্যাঙ্ক বলেছিল, যদি অনুমতি দাও তাহলে কতগুলো কথা তোমাকে বলব আমি।

নিশ্চয়ই বলবে, হঠাৎ মনের সব গ্লানি ঝেড়ে ফেলে যেন সহজ হয়ে উঠেছিল বিপাশা, তোমার সঙ্গে আমার কোন ঝগড়া হয় নি ফ্র্যাঙ্ক। শুধু আমাদের মতামত ভিন্ন—কিন্তু তুমি তোমার নিজের মতামত আমার কাছে প্রকাশ করতে সঙ্কোচ করবে কেন?

একটু আগে তোমাকে বলেছিলাম যে তুমি এক ভয়ঙ্কর মেয়ে—

কিন্তু তার জন্যে আমি কিছু মনে করি নি।

সমস্ত জীবনটাকে তুমি ভয়ঙ্কর করে তুলতে চাও কেন? কোন সুন্দর জিনিস কি তোমার চোখে পড়ে না?

পড়ে। গাছ ফুল পাখি সমুদ্র আর প্রকৃতির নানা রঙ—নানা রূপ—

আমি জীবনের কথা বলছি।

হ্যাঁ জীবন সুন্দর বইকি।

তাহলে কেন তুমি প্রেমে বিশ্বাস কর না?

মানুষ ফাঁকির একটা রঙচঙে ওড়না উড়িয়ে প্রেমকে অসুন্দর করে তোলে ব'লে। যা সুন্দর তার পরিধি কখনও সংকীর্ণ নয়—তা কখনও যন্ত্রণা দেয় না। তোমাদের প্রেম যদি জীবনের পরিধি সীমিত করে দেয় তাহলে সে-পঙ্গু জীবন আমার কাম্য নয়।

জীবন প্রেমে পঙ্গু হয় না বিপাশা। সুন্দর হয়—সার্থক হয়—

হাসিমুখেই বিপাশা বলেছিল, যৌন প্রবৃত্তিকে কী কৌশলেই না আবৃত করে রাখে তোমাদের পৃথিবীর মানুষ!

রাখুক, ঘন ঘন সিগ্রেটের ধোঁয়া ছেড়েছিল ফ্র্যাঙ্ক, সভ্যতাকে যদি স্বীকার না কর তাহলে পশুর সঙ্গে তোমার প্রভেদ কোথায়?

কিন্তু মানুষের সঙ্গে পশুর সত্যিই কামনা চরিতার্থের ব্যাপারে খুব বেশি প্রভেদ আছে কি? জোর করে মিথ্যার বোঝা মনের ওপর চাপিয়ে এই প্রভেদ বজায় রাখতে গিয়ে আমাদের গোটা জীবনটা কি অসুস্থ হয়ে ওঠে না?

না, দৃঢ় স্বরে ফ্র্যাঙ্ক বলেছিল, যৌন কামনা সংযত না করলে সারা পৃথিবীতে একটা দাবানল জ্বলে উঠত আর সেই আগুনে আমরা প্রত্যেকেই পুড়ে মরতাম।

সেটা তোমার কথা। আমার মনে হয়, পুড়ে মরতাম না। এখন যেমন তোমরা সকলে সেই আগুন বুকে চেপে রেখে তিল-তিল করে ক্ষয় করছ জীবনীশক্তি—হয়তো সে-ক্ষয় বন্ধ হত—একটু থেমে বিপাশা বলেছিল, আর আসল প্রেম কি তার মানেও বোঝা যেত তখন—বুঝলে ফ্র্যাঙ্ক?

আর কোন কথা না বলে মাথা নিচু করে তার সঙ্গে টিউব স্টেশন অবধি হেঁটে এসেছিল ফ্র্যাঙ্ক। বাড়িও এসেছিল একই ট্রেনে। কিন্তু সেই শেষ। রোজ দেখা হলেও বিপাশার সঙ্গে তার আর কোন আলোচনা হয় নি—বেশি কথাও নয়।

এখন সেসব কথা মনে করে কৌতুক বোধ করে বিপাশা। সব দেশের রীতিনীতিই তো এক। ওপর-ওপর সমাজের নিয়ম-কানুন

প্রথম দৃষ্টিতে একটু অন্যরকম মনে হলেও নিবিড় পরিচয়ের পর বিরাট একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আর তা খুঁজে পেয়েছে বলেই ভারতবর্ষ আর ইউরোপ বিপাশার কাছে এক হয়ে গেছে।

স্বার্থ বঞ্চনা আর মিথ্যার কঠিন মুখোশটা টান মেরে খুলে ফেলে সূর্যের স্বচ্ছ আলোয় মুক্তির ব্যাপক আনন্দে নিজের স্বাধীন মনটাকে পৃথিবীর সামনে মেলে ধরতে পারছে না বলেই তো মাঝে মাঝে সে দিশা হারায়। ভয় পায়। নিঃসঙ্গ বোধ করে।

এই জাহাজে যদি ফ্র্যাঙ্কও থাকত তার সঙ্গে তাহলে আহ্লাদের কটু স্বাদে বিপাশার মন ভরে উঠত। সে তার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিত প্রেমের এক-একটি সার্থক ছবি। সুরমা আর অবনী ঘোষাল। ইংগে আর অমর সিং। মনীষা আর জান্নু। গেইল। আর ভবসিন্ধু সভ্য হয়েছে বলে সিবিলের ওপর তার ধারণাটাও ফ্র্যাঙ্ককে জানিয়ে দিয়ে কৌতূহলী চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকত বিপাশা, এমন প্রেমের কাছে যদি আমি নিজেকে সমর্পণ করতে না পারি তাহলে কোন বুদ্ধিতে তুমি আমাকে ভয়ঙ্কর বল ?

তখন কী উত্তর দিত ফ্র্যাঙ্ক !

কিন্তু মনীষাকে দোষ দেয় কেন বিপাশা ! তার সঙ্গে মনীষার তফাত কোথায় ? সে নিজেও কি ফ্র্যাঙ্কের সঙ্গে খেলা করে নি ? আপন মনেই যেন বিপাশা বলে ওঠে, না। ফ্র্যাঙ্ককে শুরুতেই সব কথা জানিয়ে দিয়েছিল সে। বন্ধনে আস্থা নেই সেকথাও বলেছিল। কিন্তু মনীষা প্রবঞ্চনার খেলা খেলেছে জান্নুর সঙ্গে। তাকে জানতে দেয় নি—বুঝতে দেয় নি তার অবহেলার কথা।

সেখানেই মনীষার সঙ্গে বিপাশার সাংঘাতিক অমিল।

ডেকের অন্য প্রান্তে একা দাঁড়িয়ে আছে জান্নু। মাথা তুলছে না। একমনে ঢেউ দেখতে দেখতে কি যেন ভাবছে। ওকে আজ অনেকক্ষণ ধরে খুঁজে বেড়িয়েছে বিপাশা। কোথাও পায় নি।

বিপাশা জান্নুর কাছে এসে আস্তে ওর নাম ধরে ডাকল। বৈদ্যুতিক আঘাত খেয়ে যেন প্রচণ্ড চমকে মাথা তুলল জান্নু। কিন্তু বিপাশাকে দেখে মিলিয়ে গেল ওর মুখের আভা। ও ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

মনীষা কোথায়? প্রগাঢ় অনুকম্পায় জিজ্ঞেস করল বিপাশা।

জানি না, জল দেখতে দেখতেই বলল জান্নু, বোধহয় নিচে নাচের ঘরে গেছে।

তুমি যাও নি যে?

মরা মানুষের চোখের মতো জান্নুর চোখ। স্তিমিত। কোন ভাষা নেই। ওর সব শক্তি যেন ক্ষয়ে গেছে। এ যেন অন্য আর একটা মানুষ। ওকে চিনতে পারে না বিপাশা। যে প্রথম-প্রথম ছিল ঢেউ-এর মতোই চঞ্চল, এখান থেকে ওখানে যেত ছুটে-ছুটে, আপন মনে গান গাইত—আজ সে যেন মৃত্যুর ছোঁয়ায় ধুঁকছে। এ-যন্ত্রণা বড় কঠোর। কেমন করে মুক্তি পাবে জান্নু!

আধ-মরা একটা মানুষের পাশে ঢেউ-এর দোলায় রাতের প্রথম ঝোঁকে দুলতে-দুলতে যেন হঠাৎ দৃষ্টির পরিবর্তন হয় বিপাশার। সে ভেবেছিল জান্নু মনীষার কাছ থেকে আঘাত খেয়ে জ্বলে উঠবে—নতুন এক চেতনায় উগ্র হয়ে উঠবে। সতর্ক হয়ে ভবিষ্যতে প্রস্তুত হবে প্রবঞ্চনার প্রতিশোধ নিতে—কিন্তু কোথায় তার সেই দাহ! এ যেন জ্বলে-পুড়ে শেষ হয়ে যাওয়া একটা বৃদ্ধ মানুষ। যেন ওর আর কোন কাজ নেই এই পৃথিবীতে।

সেখানে দাঁড়িয়ে মনে মনে নিজেই জ্বলে যায় বিপাশা। কেন মনীষা একটা মানুষকে এমন করে শেষ করে দিল! আর জান্নুই বা কেন করল না প্রবঞ্চনার তীব্র প্রতিবাদ! কী যন্ত্রণায় ব্যর্থতার কাছে তার এই করুণ আত্মসমর্পণ! তাকে কি কথা বলবে বিপাশা হঠাৎ ভেবে পায় না। শুধু এই ব্যাপক যন্ত্রণার কথা ভাবে।

হয়তো জান্নুর এই বিষণ্ণ ভাব দুদিনের। যখন জাহাজ নোঙর করবে ভারতবর্ষের বন্দরে আর ওরা দুজন চলে যাবে দুদিকে—যখন

প্রথম দৃষ্টিতে একটু অন্যরকম মনে হলেও নিবিড় পরিচয়ের পর বিরাট একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আর তা খুঁজে পেয়েছে বলেই ভারতবর্ষ আর ইউরোপ বিপাশার কাছে এক হয়ে গেছে।

স্বার্থ বঞ্চনা আর মিথ্যার কঠিন মুখোশটা টান মেরে খুলে ফেলে সূর্যের স্বচ্ছ আলোয় মুক্তির ব্যাপক আনন্দে নিজের স্বাধীন মনটাকে পৃথিবীর সামনে মেলে ধরতে পারছে না বলেই তো মাঝে মাঝে সে দিশা হারায়। ভয় পায়। নিঃসঙ্গ বোধ করে।

এই জাহাজে যদি ফ্র্যাঙ্কও থাকত তার সঙ্গে তাহলে আহ্লাদের কটু স্বাদে বিপাশার মন ভরে উঠত। সে তার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিত প্রেমের এক-একটি সার্থক ছবি। সুরমা আর অবনী ঘোষাল। ইংগে আর অমর সিং। মনীষা আর জান্নু। গেইল। আর ভবসিন্ধু সভ্য হয়েছে বলে সিবিলের ওপর তার ধারণাটাও ফ্র্যাঙ্ককে জানিয়ে দিয়ে কৌতূহলী চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকত বিপাশা, এমন প্রেমের কাছে যদি আমি নিজেকে সমর্পণ করতে না পারি তাহলে কোন বুদ্ধিতে তুমি আমাকে ভয়ঙ্কর বল ?

তখন কী উত্তর দিত ফ্র্যাঙ্ক!

কিন্তু মনীষাকে দোষ দেয় কেন বিপাশা! তার সঙ্গে মনীষার তফাত কোথায় ? সে নিজেও কি ফ্র্যাঙ্কের সঙ্গে খেলা করে নি ? আপন মনেই যেন বিপাশা বলে ওঠে, না। ফ্র্যাঙ্ককে শুরুতেই সব কথা জানিয়ে দিয়েছিল সে। বন্ধনে আস্থা নেই সেকথাও বলেছিল। কিন্তু মনীষা প্রবঞ্চনার খেলা খেলেছে জান্নুর সঙ্গে। তাকে জানতে দেয় নি—বুঝতে দেয় নি তার অবহেলার কথা।

সেখানেই মনীষার সঙ্গে বিপাশার সাংঘাতিক অমিল।

ডেকের অন্য প্রান্তে একা দাঁড়িয়ে আছে জান্নু। মাথা তুলছে না। একমনে ঢেউ দেখতে দেখতে কি যেন ভাবছে। ওকে আজ অনেকক্ষণ ধরে খুঁজে বেড়িয়েছে বিপাশা। কোথাও পায় নি।

বিপাশা জান্নুর কাছে এসে আস্তে ওর নাম ধরে ডাকল। বৈদ্যুতিক আঘাত খেয়ে যেন প্রচণ্ড চমকে মাথা তুলল জান্নু। কিন্তু বিপাশাকে দেখে মিলিয়ে গেল ওর মুখের আভা। ও ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

মনীষা কোথায়? প্রগাঢ় অনুকম্পায় জিজ্ঞেস করল বিপাশা।

জানি না, জল দেখতে দেখতেই বলল জান্নু, বোধহয় নিচে নাচের ঘরে গেছে।

তুমি যাও নি যে?

মরা মানুষের চোখের মতো জান্নুর চোখ। স্তিমিত। কোন ভাষা নেই। ওর সব শক্তি যেন ক্ষয়ে গেছে। এ যেন অন্য আর একটা মানুষ। ওকে চিনতে পারে না বিপাশা। যে প্রথম-প্রথম ছিল ঢেউ-এর মতোই চঞ্চল, এখান থেকে ওখানে যেত ছুটে-ছুটে, আপন মনে গান গাইত—আজ সে যেন মৃত্যুর ছোঁয়ায় ধুঁকছে। এ-যন্ত্রণা বড় কঠোর। কেমন করে মুক্তি পাবে জান্নু!

আধ-মরা একটা মানুষের পাশে ঢেউ-এর দোলায় রাতের প্রথম ঝোঁকে দুলতে-দুলতে যেন হঠাৎ দৃষ্টির পরিবর্তন হয় বিপাশার। সে ভেবেছিল জান্নু মনীষার কাছ থেকে আঘাত খেয়ে জ্বলে উঠবে—নতুন এক চেতনায় উগ্র হয়ে উঠবে। সতর্ক হয়ে ভবিষ্যতে প্রস্তুত হবে প্রবঞ্চনার প্রতিশোধ নিতে—কিন্তু কোথায় তার সেই দাহ! এ যেন জ্বলে-পুড়ে শেষ হয়ে যাওয়া একটা বৃদ্ধ মানুষ। যেন ওর আর কোন কাজ নেই এই পৃথিবীতে।

সেখানে দাঁড়িয়ে মনে মনে নিজেই জ্বলে যায় বিপাশা। কেন মনীষা একটা মানুষকে এমন করে শেষ করে দিল! আর জান্নুই বা কেন করল না প্রবঞ্চনার তীব্র প্রতিবাদ! কী যন্ত্রণায় ব্যর্থতার কাছে তার এই করুণ আত্মসমর্পণ! তাকে কি কথা বলবে বিপাশা হঠাৎ ভেবে পায় না। শুধু এই ব্যাপক যন্ত্রণার কথা ভাবে।

হয়তো জান্নুর এই বিষণ্ণ ভাব দুদিনের। যখন জাহাজ নোঙর করবে ভারতবর্ষের বন্দরে আর ওরা দুজন চলে যাবে দুদিকে—যখন

কেউ কাউকে আর দেখতে পাবে না তখন। আবার সুস্থ সবল হয়ে উঠবে জাম্নু। আবার মেতে উঠবে আনন্দের জোয়ারে।

কিন্তু তা আর হয় না। সভ্য মানুষের ঘরের আনাচে-কানাচে মনের এই আকর্ষণের জন্যে যে পুঞ্জপুঞ্জ বেদনা জমা হয়ে আছে তা থেকে মুক্তি নেই কারুর। ঘর বাঁধলেই যন্ত্রণা মিশে যাবে প্রত্যেকটি ইঁটের সঙ্গে আর শুরু হবে তিলে-তিলে ক্ষয়। সভ্য মানুষের ঘর যেন বিপাশার ভয়ের প্রতীক।

যা মায়া—যা অসত্য তারই প্রভাবে ভেঙে চুরমার হয়ে যায় একটা মানুষ। বিজ্ঞজন কেবলই উপদেশ দিয়েছে এই দৈনন্দিন মায়ার প্রভাব থেকে মানুষকে মুক্ত হতে। আর কি করতে হবে তার জন্যে? ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে হবে—সংসারের সব বন্ধন ছিন্ন করে একা-একা সন্ধান করতে হবে সাধনার নির্জন কোন স্থান। তা সে পর্বত-শিখরেই হোক, অরণ্যের গভীরেই হোক কিম্বা সমুদ্র-উপকূলেই হোক। সেখানে গিয়ে সব ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে দিতে হবে। মহাজীবনের কোন সঙ্গীত ঝঙ্কার কানে যাবে না। অলৌকিক একটা কল্পিত কিছুর আশায় নিজের দেহকে পীড়ন করতে হবে দিনের পর দিন। তারপর সব শেষ।

বন্ধন ছিন্ন করার সেই এক কথা যুগে-যুগে ধ্বনিত হয়েছে। ছিন্ন হোক তবে বন্ধন।

মায়া থেকেও মুক্ত হোক মানুষ। কিন্তু জীবনকে একেবারে অস্বীকার করে একা-একা দূরে পালিয়ে যাওয়ার কি মানে হয়। মানুষের মধ্যে, মানুষকে নিয়েই গড়ে তোলা হোক আর এক জীবন।

কিন্তু এ-কথা কাকে শোনাবে বিপাশা।

জাম্নু, আর একবার ডাকে বিপাশা।

বলুন?

অকৃত্রিম ক্রোধে আগুনের একটা ঝলক বেরিয়ে আসে বিপাশার

চোখ ঠিকরে, নিজে বোকা বনে গেছ, একটু থামে সে, যে তোমাকে নিয়ে শুধু খেলা করেছে তার ওপর তোমার রাগ হয় না ?

আপনার কথা বুঝতে পারি না।

মনীষা কোথায় ?

উত্তর দেয় না জান্নু। মুখ নামিয়ে জলই দেখতে থাকে। বোধ হয় বিপাশা তার মনের কথা জেনে গেছে বলে লজ্জা পায়। আরও কঠিন কথা বিপাশা সাজায় মনে মনে। যেন ভুলে যায় যে সে কার সঙ্গে কথা বলছে। হ্যাঁ, রূঢ় কথা শুনিয়ে-শুনিয়ে জান্নুকে বাঁচিয়ে তুলবে সে। এতদিন পর মনের মতো একটা কাজ পেয়ে বিপাশা যেন বেঁচে যায়।

দেশ-বিদেশ ঘুরে একটা মেয়ের জন্যে তোমার এমন অবস্থা হল কেন ?

বড় মুশকিলে পড়েছি দিদি।

কিন্তু এমন কান্না-কান্না মুখ করে কি পাবে তুমি ?

কাঁদব কেন ? ম্লান স্বরে জান্নু প্রতিবাদ করে, আমি কাঁদি না।

কিন্তু ফুর্তি নেই কেন তোমার মনে ?

বিপাশার ভাষা অনুকরণ করে জান্নু বলে, ফুর্তি নেই। আমি লেখাপড়া জানি না—আমি একটা বোকা—

চিৎকার করে বিপাশা বলে ওঠে, সেকথা প্রথমে কেন খেয়াল হয় নি মনীষার ? তুমি তার কাছে কৈফিয়ত চাইতে পার না ?

না।

কেন ?

সে আমার চেয়ে অনেক বড়—

জান্নু ! কঠিন একটা ধমক দিয়ে বিপাশা বলে, তোমরা সব জেনে শুনে ইচ্ছে করে ঠক বলে ওরা তোমাদের ঠকায়—

না দিদি। মনীষা খুব ভাল মেয়ে। সে আমাকে ঠকাবে না।

তাহলে কেন তুমি এখানে একা-একা দাঁড়িয়ে কাঁদ ? কোথায় সে ? এখন এসে তোমার সঙ্গে গল্প করতে পারে না ?

ম্লান হেসে জান্নু বলে, আসবে।

না, আসবে না, জান্নুর ভুল ভেঙে দিয়ে বিপাশা মনীষার কথা না ভেবেই রূঢ় স্বরে বলে, তোমার সঙ্গে আর সে কখনও হেসে কথা বলবে না।

জান্নু কিন্তু হেসে বলে, না বলুক। কেন কথা বলবে বলুন? আমার কপাল বড় ভাল বলে এতদিন সে আমার সঙ্গে কথা বলেছে। এ-জাহাজের সব বড় মানুষরা তাকে কত নিন্দে করেছে তো সেইজন্যে—

হঠাৎ যেন কথা বন্ধ হয়ে যায় বিপাশার। জান্নুর মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে তার চোখ দুটো স্তব্ধ হয়ে থাকে। কেন জ্বলে উঠছে না জান্নু? কেন বিপাশার কঠিন কথাগুলো তার কানে প্রলাপের মতো শোনাচ্ছে? আর ক্ষমার অদ্ভুত একটা জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার কপাল? বিচ্ছেদ-বেদনার এমন মধুর স্বাদ বোধহয় কোনদিনও পাবে না বিপাশা। কয়েক মুহূর্তের জন্যে সে যেন নিজের অস্তিত্বই বিশ্বাস করতে পারে না। পাথরের মতো ঠাণ্ডা হয়ে যায়। নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ।

আর যখন বিপাশা থেমে যায় তখন জাহাজটা ডেকে ওঠে কয়েক বার। বাঁশির ভাষা বুঝতে না পারলেও সে চমকে ওঠে। আর হাসির আভা খেলে জান্নুর ঠোঁটে। এতক্ষণ পর সে হাসছে। কেন হাসছে সেকথা বুঝতে পারে না বিপাশা।

তুমি হাসছ কেন?

হাসলেও আমার বড় দুঃখ দিদি, নিজের মনের গভীরে কি যেন দেখতে পায় জান্নু, আমি বাপের অনেক টাকা নষ্ট করেছি। মদ খেয়েছি। জুয়ো খেলেছি। মিথ্যা কথা বলেছি—

এখন বুঝি অনুতাপ করছ?

বিপাশার কথার ঠিক অর্থ বোধহয় ধরতে না পেরে জান্নু বলে, না, আর পাপ করব না। তবে কি জানেন দিদি, ইচ্ছে করলে আমিও

বড় মানুষ হতে পারতাম। ছেলেবেলায় ইস্কুলে মাস্টারবাবু বলত আমার খুব বুদ্ধি আছে—

না জান্নু, সহজ সুরে বিপাশা বলে, তোমার একটুও বুদ্ধি নেই। বুদ্ধি থাকলে মনীষাকে তুমি সমুদ্রের জলে ফেলে দিতে—

জান্নু জিব কাটে, কী বলেন দিদি! ওই তো আমাকে বাঁচিয়ে দিল—একেবারে ভাল করে দিল—

কেমন করে?

সেকথা আমি আপনাকে বলতে পারব না। তবে দিল্লী গিয়ে আমি বাপের পা ধরে মাপ চাইব। আমি কলকাতায় ব্যবসা করতে আসব—এক পয়সাও আর নষ্ট করব না। কিন্তু বাপ আমাকে বিশ্বাস করবে তো দিদি?

করবে, অনুকম্পার আভা ফুটে ওঠে বিপাশার মুখে, কলকাতায় তুমি তো মনীষাকে দেখতে আসবে জান্নু। ব্যবসায় মন দিতে পারবে কি?

ঠিক পারব। তার সঙ্গে আমার আর জীবনে দেখা না হলেও কোন লোকসান হবে না। মাথা এখন আমার একদম ঠিক হয়ে গেছে।

এখন কোথা থেকে রাজ্যের লজ্জা এসে যেন পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে বিপাশার দেহকে বাঁধে। জান্নুর পাশে দাঁড়িয়ে তার নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। আর হঠাৎ মনে-মনে ভাবে বিপাশা যে ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসার ঝাঁজ ছাড়িয়ে অতলান্তিক-হৃদয়ের গভীর থেকে এক দুর্লভ হীরকখণ্ড আবিষ্কার করতে পেরে জীবনের রূপটাই বদলে গেছে জান্নুর চোখে। আর হার হয়েছে বিপাশার।

সে যেন যন্ত্রণার আগুনে পুড়িয়ে মারতে এসেছিল জান্নুকে। বেদনার মাধুরী দিয়ে জীবনকে মহৎ করে তোলবার বিদ্যা তার জানা নেই। তার পাশে দাঁড়ানো একটা অশিক্ষিত মানুষ দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ চুল-চেরা দেনা-পাওনা নিয়ে নিজেকে ছোট প্রমাণ করে নি—অনেক বড় হয়ে উঠেছে।

আর বিপাশা?

কিন্তু যা-ই বলুক না জানুক, আর ব্যর্থতার সুধায় ভরে যাক তার মন—মনীষা আর কথাই বলে না বিপাশার সঙ্গে। যদিও দুজনের দেখা হয় খুব কম। বিপাশা জানে না মনীষা কখন কোথায় থাকে। কেবিনে ঘুমতে আসে অনেক রাতে আর দিনের বেলা দূর থেকে বিপাশাকে দেখলে সে যেন তাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে।

যায় যাক। যদি ইচ্ছে করে তার কাছে কেউ না আসে তাহলে জোর করে তাকে টানে না বিপাশা। এড়িয়ে তো অনেকেই যায় তাকে। এই জাহাজের প্রথম শ্রেণীর সভ্য শিক্ষিত সহযাত্রীরা তাকে নিয়ে যে আড়ালে নানা মুখরোচক আলোচনা করে সেকথা তার অজানা নেই। করুক। এই মানুষগুলো বিপাশাকে যত দূরে-দূরে রাখে ততই তার মঙ্গল। ব্যক্তিগত প্রশ্ন করে তাহলে কেউ তাকে সেই এক কথাই দশবার বলাবার চেষ্টা করবে না।

জাহাজ বড় বেশি দোলে এ-সমুদ্রে। আরব সাগর। দিনের আলোয় দেখা যায় হিংস্র হাঙরের দল জাহাজের আশেপাশে আহারের সন্ধানে ঘোরাঘুরি করে। আর জলের একটা লালচে আভা আছে। প্রকৃতিকেও যেন চেনা-চেনা মনে হয়। গরম হাওয়া গায়ে লাগে—যেন আগুনের কড়া ঝাঁজ।

ভারতবর্ষ এসে গেল। আরব সাগর পেরিয়ে জাহাজ পড়বে ভারত মহাসাগরে আর তারপরই সূর্যের আলোয় ঝলমল করে উঠবে ভারতবর্ষের তোরণদ্বার। আর দেরি নেই। মাত্র দুদিন। বুকের কাঁপন দ্রুত হয় বিপাশার।

ভারতবর্ষে কি অপেক্ষা করছে তার জন্যে! কেন সে দেশে ফেরবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল শেষের দিকে! কে আছে তার? কার বুকে ছোট মেয়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে সে তার ক্লান্তি উজাড় করে ঢেলে দেবে!

হয়তো ভাবনায়-ভাবনায় শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছে ব্রজকিশোরবাবুর। মেয়েকে এতদিন পর দেখে তিনি বোধহয় খুশি হবেন

না। থেকে থেকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলবেন। আর করুণ গম্ভীর হয়ে উঠবে তাঁর মুখ। হঠাৎ বিপাশার মনে হয় যে দেশে না ফিরলেই যেন ভাল হত। সে তো ভুলেই ছিল সব। ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ ভুলে নিজেকে মিশিয়ে দিতে চেয়েছিল বিশ্বের ধূলিকণায়। বিষের ভাণ্ড উপুড় করে দূরে ঠেলে ফেলে ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল সুধাভাণ্ড প্রতিপক্ষের কাছ থেকে। কিন্তু কি হল।

নিজেকে মনে মনে কঠোর শাসন করে বিপাশা। সংযত করবার চেষ্টা করে ভাবপ্রবণ হৃদয়ের উত্তাল উচ্ছ্বাস। দুর্বল হয়ে পড়লে চলবে না। তাকে বেঁচে থাকতে হবে বিষ গলায় নিয়েও—বাঁচিয়ে রাখার কাজে মেতে উঠতে হবে।

ঘর সে তো নিজেই ভেঙেছে। আকর্ষণের সব চিহ্ন নিজেই রূঢ় হাতে মুছে দিয়েছে একে-একে। এখন যদি জান্নুর মতো সে-ও নিজেকে ব্যর্থ মনে করে আর কল্পনায় সৃষ্টি করবার চেষ্টা করে এক নতুন জগৎ তাহলে তার চেয়ে বড় প্রতারক আর কেউ থাকবে না এ-পৃথিবীতে। নিজেকে এমন করে ঠকিয়ে কি লাভ হবে বিপাশার।

আসলে সে নিজে যে প্রতিপক্ষ দলেরই মেয়ে। তার পূর্বপুরুষের স্বার্থ আর সংস্কার আর বিলাসী মনের কৃত্রিম দাহ যুগ যুগ ধরে সঞ্চারিত হয়ে এসেছে তারই রক্ত কণিকায়—শিরায়-শিরায়। সেই মনই তাকে ভয় দেখায়—দুর্বল করে তোলে—তাকে কাঁদাতে চায়।

কিন্তু কাঁদবে না বিপাশা। বিলাসী ভীরু মনের এক-একটি জ্বালাময় আঁচড় ছাড়া তার কাঁদবার আর কোন কারণই তো নেই। সেই মনটাকে কেনও সে আজও বদলে নিতে পারল না। নিজের কথা ভাবতে-ভাবতে ট্যুরিস্ট ক্লাসের যাত্রীদের আর একবার দেখতে চায় বিপাশা। ওদের সঙ্গে এক হয়ে মিশে যেতে চায়। সভ্যতার হীন আক্রমণ থেকে নিজে মুক্ত হয়ে ভবসিন্ধুর মতো মানুষকে সতর্ক করে দিতে চায়।

আর তখন যেন দুর্বল বনেদী মনটাকে জয় করবার জন্যে সে চোখ ফেরায় সমুদ্রের দিকে। সূর্যের আলোয় জ্বলছে বিশাল সমুদ্র। তুচ্ছ ভাবনা-চিন্তা ঢেউ-এর এক-এক ঝাপটায় ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। ক্ষিপ্ত সমুদ্র সহ্য করে না মনের কোন ক্ষুদ্র বিলাস। মনকে মাতিয়ে দেয়। জাগিয়ে দেয়। কেটে টুকরো-টুকরো করে দেয়।

পর মুহূর্তেই যেন জোড়া লাগায় সেই খণ্ড খণ্ড মনটাকে। মহত্বের ছোঁয়ায় উজ্জ্বল করে তোলে। পিছনে পড়ে থাকে সব। ঘরোয়া হাসি-কান্না, মান-অভিমান আর সংকীর্ণ জীবনের জোলো সুখ-দুঃখ। কী বিপুল আহ্বান! রক্ত নাচে ঢেউ-এর তালে তালে!

তলোয়ারের মতো কঠিন হয়ে ওঠে বিপাশার দেহ। আর সমুদ্রের মতো নির্ভীক মন। কী আশ্চর্য পরিবর্তন!

একদিকে জান্নু যেমন ভেঙে পড়েছে, অন্যদিকে তেমনি মনীষাও। জান্নু রূঢ় আঘাত খেয়ে টুকরো-টুকরো হয়ে ধুলোয় মিশে যায় নি কিন্তু নিজের মধ্যে আবিষ্কার করতে পেরেছে কর্মের এক বিশাল জগৎ।

যদি মনীষার সঙ্গে তার দেখা না হত তাহলে হয়তো পরিবর্তনের এমন স্থির উজ্জ্বল আভায় নতুন রূপ পেত না তার জীবন। পাল-ছেঁড়া ভাঙা একটা নৌকোর মতো বিলাসের সুলভ ঝাপটায় সে ভেসে-ভেসে বেড়াত এখান থেকে সেখানে। হয়তো এত সহজে হৃদয়ের গভীর দিকটার সন্ধান পেত না।

তাই মনে মনে মনীষার প্রশংসা না করে পারে না বিপাশা। যদিও জান্নুর ব্যাপার নিয়ে তার সঙ্গে একদিন কঠিন স্বরে কথা বলেছিল তবুও আজ মনে হয় নিষ্ঠুরতারও বিশেষ একটা মূল্য আছে। প্রবঞ্চনার মধ্যে শুধু জ্বালা আর গ্লানিই নেই—আকাশ-জোড়া গাঢ় একটা রঙও যেন আছে—চেতনার কিম্বা গভীরতার দীপ্তিতে উজ্জ্বল আশ্চর্য একটা রঙ!

তবে মনীষাকে হঠাৎ এখন চিনতে পারে না বিপাশা। চোখের কোণে কালো রেখা পড়েছে। অবিন্যস্ত চুল। প্রসাধনে রুচি নেই। চলার গতি অদ্ভুত রকম শ্লথ। বলার ধরন একেবারে ঠাণ্ডা। নিষ্প্রভ একটা শরীর যেন কঠিন ক্লান্তিতে অবশ।

আর তার দেখাই পাওয়া যায় না আজকাল। দিনের আলোয় কোথায় হারিয়ে যায় কে জানে। মাথা নিচু করে খাবার টেবিলে আসে। কারুর দিকে তাকায় না চোখ তুলে। খাওয়ার ভান করে বটে, তবে একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে আহারে তার প্রবৃত্তি নেই।

অনেক রাতে কেবিনে আসে। ঘুমোয় না। বসে বসে পোর্ট-হোল দিয়ে সমুদ্র দেখে। কিছু জিজ্ঞেস করলে ম্লান হাসে। কথার উত্তর দেয় না।

কঠিন কথা শুনে বিপাশার ওপর অভিমান হল কিনা কে জানে। সঙ্কোচের একটা কাঁটা যেন খোঁচা মারে বিপাশার বুকের মধ্যে। হুদিনের পরিচয়। যার যা খুশি করুক। ওদের কাছে অত স্পষ্ট ভাষায় নিজের মত প্রকাশ করবার দরকার কি!

তাই হুপুরের দিকে মনীষাকে আড়ালে ধরবার চেষ্টা করে বিপাশা। জাহাজ থেকে নেমে বন্দরে পা বাড়াবার আগে হালকা হাসি দিয়ে ব্যাপারটা সহজ করে তুলতে চায়। কিন্তু কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না মনীষাকে।

রোদ হঠাৎ যেন নিবে গেছে। অদ্ভুত নীল একটা আভা ফুটে উঠেছে আকাশের এক প্রান্তে। আর ডানা ঝাপটে আশ্রয়ের ক্লান্ত চেষ্টায় জাহাজের কাছাকাছি উড়ে ফিরছে সুন্দর একটা পাখি। কখন বিশ্রাম করতে পারবে ওই ছোট পাখি!

ডেকের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে যায় বিপাশা। প্রত্যেক চেনা-মুখ ঘুরে ঘুরে দেখে বার বার। হাসির বান ডাকিয়ে আসর জমিয়েছে ছাত্রর দল। তন্দ্রার ঘোরে পাশাপাশি হুটো ডেক-চেয়ারে চোখ বুজে

এসেছে ইংগে আর অমর সিং-এর। ফিসফিস স্বরে সমর কথা বলে চলেছে অলগার সঙ্গে। অবনী ঘোষাল খবরের কাগজ পড়ছে। বিবর্ণ মুখ সুরমার। স্বামীর আদেশেই ভয়ে-ভয়ে বোধ হয় তার পাশে বসে আছে পাথরের প্রাণহীন মূর্তির মতো। গেইল ঝুঁকে পড়েছে রজার্সের গায়ের ওপর।

মনীষা এখানে নেই।

ট্যুরিস্ট ক্লাসের দিকে পা বাড়ায় বিপাশা। মড়ার মতো শতরঞ্চির ওপর পড়ে আছে এক-একটি মানুষ। ইসমাইল আর করিম। হাসি ফুটে উঠেছে ভবসিন্ধুর মুখে। কি একটা ফল থেমে থেমে খাচ্ছে সিবিল। বাচ্চাগুলোও যেন অবসন্ন এখন। জান্নুর চোখে ঘুম নেই—হাসিও না। সে সমুদ্র দেখছে। কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি একই—কোন পরিবর্তন নেই। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ জান্নু বসে আছে বটে কিন্তু সত্যি তরঙ্গের বিচিত্র লীলা তার মনে ক্ষীণ কৌতূহলও জাগাচ্ছে কিনা কে জানে।

মনীষা এখানেও নেই। বার-এ নেই। লাউঞ্জে নেই। তবে কোথায় গেল ? বাইরে তাকিয়ে ছোট পাখিটাকে আর একবার খোঁজে বিপাশা। সেটাও নেই। ঝিমিয়ে-ঝিমিয়ে ঢেউ কেটে-কেটে এগিয়ে চলেছে বাইশ হাজার টনের বিরাট জাহাজ। কে হাসল কাঁদল হারিয়ে গেল হতাশার ঠাণ্ডা ঝাপটায় কান্নার করুণ অন্ধকারে—তা ভেবে থেমে থাকবার সময় নেই। বন্দর এলে তখন থামবে।

কিন্তু হঠাৎ মনটাকে হালকা করবার চেষ্টা করে বিপাশা। এসব কথা কেন এখন মাথায় খেলে তার! মনীষা নিশ্চয় আছে এদিক-ওদিক—এই জাহাজের কোথাও না কোথাও। তাকে ঘিরে একটা অশুভ ছায়া কাঁপিয়ে তোলবার কোন মানে হয় না।

জাহাজের একেবারে পেছন দিকে চলে আসে বিপাশা। লোহার সরু সিঁড়ির দু-তিনটে ধাপ পেরিয়ে নিচে নামে। সামনে ছোট-বড় কয়েকটা নৌকো আর অনেক লাইফ-বেল্ট। যদি কখনও জাহাজ ডোবে তাহলে যাত্রীদের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে এগুলির ভিড়।

এদিকে কখনও আসে নি বিপাশা। বোধ হয় কেউই আসে না। লাইফ-বেল্ট পরিয়ে রোজ যখন নিয়ম মতো কয়েক মুহূর্তের জন্যে ক্যাপ্টেন প্রত্যেক যাত্রীকে ব্যায়াম করায় তখন সকলেই হাসে। এ জাহাজ যেন একটা নিরাপদ আশ্রয়। এখানে লঘু চঞ্চল অলস জীবনের পাখায় ভর করে মৃত্যুর কথা কারুর মাথায় আসে না—কোন বিপদের কল্পনাও নয়।

জাহাজের পাটাতনের ওপর একটা স্থির নৌকোর মধ্যে মনীষাকে খুঁজে পেয়ে বিপাশা অবাক হয়ে যায়। দেহ টান-টান করে সে শুয়ে আছে। কপালে কয়েকটা রেখা পড়েছে। একটু কুঁচকে আছে চোখ। যেন ভাবনার শেষ নেই ওর।

বিপাশাকে ঝুঁকে পড়তে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায় মনীষা। হাসে না। ক্লান্ত স্বরে শুধু বলে, তুমি এখানে?

তোমাকে খুঁজতেই এসেছি।

মনীষা যেন অবাক হয়, আমাকে খুঁজতে? কেন বিপাশাদি?

এমনি, বিপাশা হাসে, বম্বে এসে গেল। যে যার বাড়ি চলে যাবে দুদিন পর তাই—

খুব আস্তে মনীষা বলে, বম্বে এসে গেল, না?

হ্যাঁ। পরশু এডেন ছেড়েছি। আর ঠিক দুদিন, মনীষাকে দেখতে দেখতে বিপাশা বলে, তারপরই ভারতবর্ষ।

তুমি কলকাতাতেই থাকবে বিপাশাদি?

আপাতত। তুমি?

কি জানি, নৌকো থেকে বেরিয়ে আসে মনীষা, আমার কিছু ঠিক নেই। ভাবছি আবার বিলেতেই ফিরে যাব—

দেশে ফিরতে না ফিরতেই আবার বিদেশে যাবার ভাবনা কেন?

বিপাশার হাত টেনে তাকে এক জায়গায় বসায় মনীষা। তারপর নিজে তার পাশে বসে পড়ে বলে, আমার কিছু ভাল লাগে না। যতই

দেশের কাছাকাছি আসছি ততই আবার বিদেশে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে। তোমার কিছু মনে হয় না বিপাশাদি?

অল্প হেসে বিপাশা বলে, আগে ফিরি তো। তারপর ভেবে-চিন্তে না হয় একটা কিছু ঠিক করা যাবে।

হঠাৎ বিপাশার প্রশংসা করে মনীষা বলে, তুমি বেশ আছ বিপাশাদি। তোমাকে সত্যি আমার হিংসে করতে ইচ্ছে করে—

কেন বল তো?

কোন বন্ধন নেই—কোন দায় নেই। তোমার চেয়ে সুখী কে!

তোমার দুঃখই বা কি মনীষা?

আমি ঠিক জানি না। তবে এখন আমার কিছুই ভাল লাগে না। কারুর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে না। শুধু মনে হয়—

কি?

যদি লেখাপড়া না শিখতাম, যদি বিলেতে না আসতাম, যদি এ বংশে আমার জন্ম না হত—

তোমার কি হয়েছে মনীষা?

কথার উত্তর না দিয়ে হঠাৎ মনীষা জোরে হেসে ওঠে, ওই নৌকো-গুলো দেখেছ বিপাশাদি? আচ্ছা, ওগুলো এখানে রাখবার কোন মানে হয়? তুমিই বল—

যদি কখনও জাহাজ ডোবে—

মনীষা আরও জোরে হাসে। কথা শেষ করতে দেয় না বিপাশাকে, সে-কথাই তো বলছি। সমুদ্রের বড় বড় ঢেউ তুমি দেখেছ নিশ্চয়ই। এই পুচকে নৌকো নিয়ে কখনও অমন ভয়ঙ্কর ঢেউ-এর সঙ্গে পাল্লা দেয়া যায়?

হয়তো যায়, হালকা সুরেই বিপাশা বলে, তা না হলে ওগুলো ওরা এখানে জড়ো করে রাখবে কেন? আর নৌকোগুলো বোধ হয় ডোবে না—

না ডুবুক। কিন্তু ঢেউ-এর ধাক্কায় উলটে তো যেতে পারে—তখন?

তার আগেই আর একটা জাহাজ এসে পড়বে। আজকাল কোন মানুষ জাহাজ থেকে পড়ে গেলেও নাকি ডুবে মরে না।

কিন্তু মনীষা যেন শুনতে পায় না বিপাশার কথা, কয়েক মিনিটের মধ্যেই তুমি একেবারে অদৃশ্য হয়ে যেতে পার বিপাশাদি—ঢেউ-এর সঙ্গে মিশে যেতে পার। আচ্ছা, সমুদ্রের তলায় কি আছে? অনেক মণি-মুক্তো?

হ্যাঁ। কিন্তু অনেক রকম সামুদ্রিক জীবও আছে।

তা তো আছেই। দলে দলে হাঙররা যখন ঘুরে বেড়ায় তখন ওদের দেখতে আমার বেশ লাগে। আমি সমুদ্রের কোন একটা জীব হয়ে যেতে পারি না বিপাশাদি?

একটা উড়ে-পড়া চুল মনীষার কপাল থেকে সরিয়ে দিয়ে বিপাশা বলে, আমরা সকলেই তো জীব। কেউ জলের—কেউ স্থলের।

আমার কিন্তু জলই অনেক ভাল লাগে, মাথাটা বোধহয় ঠিক নেই মনীষার, জল না দেখে আমি বোধহয় আর বাঁচতে পারব না—

জল দেখবে। কলকাতায় কি গঙ্গা নেই?

আমি সমুদ্রের কথা বলছি। সমুদ্রের বুকে ভাসতে-ভাসতে সমুদ্র দেখা—তার চেয়ে ভাল আমার আর কিছুই লাগে না।

দু-এক মিনিট চুপ করে থেকে আবার মনীষা বলে, জাহাজে উঠে আমি শুধু মানুষই দেখেছি। সমুদ্রের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখি নি। সেকথা ভেবে এখন আমার দুঃখ হয়। আমি কেন প্রথম থেকে শুধু সমুদ্র দেখলাম না? কেন জান্নুকে দেখলাম!

মনীষার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সুযোগ পেয়ে বিপাশা বলে ওঠে, তাকে দেখেছ বলেই তো সমুদ্রকে তুমি নতুন করে দেখতে শিখলে মনীষা। এমন চোখ সকলের থাকে না।

কিন্তু সমুদ্রকে আমি এমন করে দেখতে চাই নি—চাই নি। আমি আগে যেন অনেক ভাল ছিলাম!

আবার বিপাশা জিজ্ঞেস করে, তোমার কি হয়েছে? জান্নুর মতো

তুমিও দেখছি একেবারে বদলে গেছ। কেন এমন করে তোমরা শুধু শুধু দুঃখ পাও?

স্থির দৃষ্টিতে মনীষা কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে বিপাশার মুখের দিকে। তারপর থেমে থেমে জিজ্ঞেস করে, জান্নুর সঙ্গে তোমার কথা হয়েছে না কি? সে কি বলেছে? আমার ওপর খুব রাগ?

বিপাশা মাথা নেড়ে বলে, না না। সে মনে মনে অনেক বড় হয়ে উঠেছে। কিন্তু তোমার এমন অবস্থা কেমন করে হল মনীষা? তুমিই না সেদিন আমাকে বলেছিলে—

আমি তোমাকে সব মিথ্যা কথা বলেছিলাম বিপাশাদি—সব ভুল বলেছিলাম। আমি কারুর সঙ্গে খেলা করতে চাই নি—

কিন্তু তাহলে তুমি কি চেয়েছিলে? মনীষাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টায় বিপাশা বলে, খেলা করলেই তো ভাল করতে!

শেষ অবধি তা করতে পারলাম কই, বিপাশার আরও কাছে সরে এসে মনীষা শক্ত করে তার একটা হাত ধরে, আমি ছেলেমানুষ নই। এ-বয়সে এমন বোকার মতো বসে থাকা আমাকে একেবারেই মানায় না। কিন্তু কেন—কেন আমার এমন অবস্থা হল!

তুমি কি চাও মনীষা?

আমি মরে যেতে চাই। আমি বাঁচতে চাই না।

বিপাশা হেসে বলে, তুমি পাগল। এত দেখলে—এত ঘুরলে, কিন্তু আশ্চর্য এখনও দেখছি সত্যি একটা ছোট মেয়ের মতো কথা বলছ—

মনীষা বাধা দেয়, আমি যদি না ঘুরতাম—কিছু না দেখতাম—কিছু না জানতাম তাহলে আজ আমাকে এমন করে লুকিয়ে বেড়াতে হত না। অনেক জেনেছি বলেই একটা সঙ্কোচ আমাকে দূরে সরিয়ে রেখেছে।

কিসের সঙ্কোচ?

আমি ঠিক জানি না। কিন্তু আমার মনের ভয়ঙ্কর এক দম্ভ আর অদ্ভুত এক ভয়—আমি যা চাই তা মেনে নিতে দিচ্ছে না। তাই

আর একজনকে ইচ্ছের বিরুদ্ধে আঘাত করছি আর আমি নিজে জ্বলে যাচ্ছি, হঠাৎ মাথা তুলে বিপাশার চোখে চোখ রেখে মনীষা বলে, আমরা এত অসহায় কেন বিপাশাদি?

তোমার কথার উত্তর দেশে ফিরে একদিন দেব। কিন্তু এখন এমন করে তুমি ভেঙে পড় না—কি করতে চাও সেকথা বল?

কোন রকমে যেন কথা বলে মনীষা, আমি জানি না। আমার সব গোলমাল হয়ে গেছে।

বিপাশারও সব যেন গোলমাল হয়ে যায়। আসলে কি হয়েছে মনীষার—তা সে ভাল করে বুঝতে পারে না। জান্নুর সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক খেলা করতে-করতে গড়ে উঠেছে সেকথা ঠিক—কিন্তু তাহলে মনীষার মতো মেয়ে এমন করে দূরে সরে থাকবে কেন? জান্নুর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নিলেই তো সব চুকে যায়।

কিন্তু অন্য পক্ষ থেকে আঘাত এসেছে কিনা সেকথাই বা কে জানে! হয়তো কিছু করবার উপায় নেই। প্রথমে বোধহয় স্বীকার করতে পারে নি জান্নু—কিন্তু পরে মনীষা আবিষ্কার করেছে তার একটা স্ত্রী আছে। তাই ভেঙে পড়েছে তার সমুদ্রে গড়ে ওঠা মণিময় প্রাসাদ।

কিন্তু বিপাশা এখন কি বলবে তাকে!

একটা অবলম্বনের মতো মনীষা মনে করে বিপাশাকে। কথার জোয়ারে নিজের মনটাকে যেন তার চোখের সামনে মেলে ধরে। থেকে থেকে আকাশের দিকে তাকায়। ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নেয় এদিকে কেউ আসছে কিনা। আর মাঝে মাঝে কান পেতে কী যেন শোনবার চেষ্টা করে।

মনীষা বলে যায়, আমি মনে মনে যা স্বীকার করে নিয়েছি—বাইরের পাঁচজনের সামনে তা কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। এ যে কী ভয়ঙ্কর দ্বন্দ্ব সেকথা তোমায় বোঝাতে পারব না বিপাশাদি—যদি

সবই দিতে পারলাম তাহলে ওর সঙ্গে চিরকাল থাকতে আমার বাধা কোথায় ?

বিপাশা বলে, বাধা থাকবে কেন মনীষা ! কোন বাধা নেই।

আছে বিপাশাদি, আছে, দৃঢ় স্বরে মনীষা বলে, আমার বিদ্যা-বুদ্ধি, আমার বংশের অহঙ্কার—এখনও একটা দাম্ভিক মন কেবলই আমায় খোঁচা দিয়ে-দিয়ে ওর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। তাই ওর সঙ্গে চিরকাল থাকবার কথা ভাবতে গেলেই আমি জ্বলে যাই আর সেকথা ওকে জানাতেও পারি না—

কি বলেছ তুমি ওকে ?

স্পষ্ট করে কিছুই বলতে পারি নি। ও কি ভেবেছে আমাকে আমি তাও জানি না, একটু চুপ করে থেকে মনীষা বলে, হয়তো এ জাহাজের লোকগুলো আমাকে যেমন মনে করে, জান্নুও ঠিক তেমন ভাবছে—

বিপাশা বলে, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি এমন করে ভেঙে না পড়ে তুমি কিছুদিন সময় নাও মনীষা—তখন নিজের মনই তোমাকে ঠিক পথের সন্ধান দেবে আর এসব দ্বন্দ্বের কথা তোমার মাথায় আসবে না। তোমার উদারতাই তোমাকে শান্তি দেবে।

কিছু হবে না বিপাশাদি—কিছু না। মাথা ঝাঁকিয়ে মনীষা কথা বলে, আমি অনেক ভেবেছি। আমার শিক্ষার দম্ভের জন্যেই সব কাদা-কাদা হয়ে গেল। বিদেশে গিয়ে সব ভুলেছিলাম। গা ছেড়ে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম সব সংস্কার—এ-জাহাজেও তো তুমি আমার চলাফেরার ধরন দেখেছ ?

বিপাশা হেসে বলে, দেখেছি।

কিন্তু ওসব ওপর-ওপর। বাইরে হইহই করলে হবে কি, ভেতরে-ভেতরে আমি যেমন ছিলাম ঠিক যেন তেমনই আছি। দেশের কাছে যতই এগিয়ে আসছি ততই আমি হিম হয়ে যাচ্ছি। আমার কোন আত্মীয়-স্বজনের কাছে আমি ওর পরিচয় দিতে পারব না—একথা

স্বীকারই করতে পারব না কারুর সামনে তাই একা বসে-বসে নিজেকে শুধু ধিক্কার দিচ্ছি।

হয়তো মনীষা দেখতে পায় না কিন্তু বিপাশার ঠোঁটের মাঝে মুহূর্তের জন্যে হাসির পাতলা একটা রেখা ফুটে ওঠে। বয়স কম মনীষার। ছুদিনের নেশায় বিভোর হয়েছে। মোহ বলেই সব কিছু ভুলে জান্নুকে মেনে নিতে পারছে না।

জাহাজ লাগুক বন্দরে। যাত্রীদের কোলাহল জাগুক। চেনা মাটির গন্ধ নাক ছুঁয়ে যাক—মনীষা সব ভুলে যাবে। কিন্তু সেকথা এখন বিপাশা বলে না তাকে। প্রসঙ্গ পরিবর্তনের চেষ্টা করে। একথা-ওকথা বলে সময় কাটায়।

আর অনেক পরে বিকেলের চা খাবার ঘণ্টা বাজে। তখন এক রকম জোর করেই বিপাশা খাবার ঘরে সেই অবস্থায়ই মনীষাকে টেনে নিয়ে যায়।

আজ রাতে সমুদ্রের ক্ষুধা আরও প্রবল। জাহাজ অনেক বেশি দুলছে। ডেক-এ যেমন হু-হু হাওয়ার দাপাদাপি, কেবিনের মধ্যে তেমন বিরক্তিকর গুমট গরম। হঠাৎ ফোঁটা-ফোঁটা বৃষ্টি শুরু হয়েছিল বলে বিপাশা অনেক আগেই কেবিনে চলে এসেছে। তার চোখে ঘুম আসতে এখনও অনেক দেরি।

সারা রাতের মধ্যে ঘুম আসবে কিনা কে জানে।

আর কেউ নেই কেবিনে এখন। গেইল ঘুমতে আসে বোধহয় রাত ভোর হবার আগে-আগে। কোন কোনদিন খোলা হাওয়ায় বাইরে শুয়েও রাত কাটায়।

আর মনীষা ? সেও তাই করে।

আজ কিন্তু কারুরই দেখা নেই।

রাত কত হবে এখন ?

বোধহয় অনেক। কোন কোলাহল নেই জাহাজে। আশ্চর্য

নীরব। বাইরের অনেক আলো নিবিয়ে দেয়া হয়েছে। বিছানার ওপর উঠে বসে বিপাশা পোর্ট হোল দিয়ে আর একবার সমুদ্র দেখে। ভয় পায়।

কী বিশাল এক-একটি ঢেউ! আর তার দেহ যেন একটা তৃণ-খণ্ডের মতো। সমুদ্রের কাছে বিপাশার নিজেকে হঠাৎ তৃণের মতোই মনে হয় বটে।

জাহাজ দুলছে আর একটু-একটু করে বম্বে এগিয়ে আসছে। তারপর? মাথা দপ্‌দপ করে বিপাশার। চোখ জ্বলে। একটি কথা শুধু ফিরে ফিরে তার মনে বাজে, তারপর?

দেশের মাটিতে কেমন করে শুরু করবে সে তার নতুন জীবন? কোন কাজ দিয়ে মানুষের সব দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে নিজের জন্যেও সৃষ্টি করবে আর এক নতুন জগৎ!

চাকরি একটা তার জুটে যাবে নিশ্চয়ই। যন্ত্রের মতো ঘড়ি ধরে রোজ় সে কাজ করতে যাবে আর আসবে। টাকা-পয়সার কোন অভাব হয়তো তার এ-জীবনে হবে না।

কিন্তু ও-ব্যাপারটা বিপাশার কাছে একেবারেই তুচ্ছ। সকলের আর্থিক অভাব ঘুচে যাবার সময় হয়েছে। হয়তো একদিন ঘুচে যাবেও।

কিন্তু যে-ব্যথা বুকে নিয়ে ম্লান হয়ে আছে জাম্মু, যে-যন্ত্রণায় জ্বলছে মনীষা, যে-আগুনে দিনের পর দিন পুড়ছে সুরমা আর যে-দংশনে ক্ষত-বিক্ষত বিপাশা নিজে—তার কি হবে?

ইসমাইলের কথা হঠাৎ মনে হয় বিপাশার। তার কথা ঠিক। চিরকালের প্রেম-বিরহের কথা নিয়ে দেশ-বিদেশের কবি অনেক কাব্য আর উপাখ্যান রচনা করেছে কিন্তু মুক্তির সন্ধান করে নি কি কেউ?

হ্যাঁ, করেছে।

হয় মরেছে, নয় ধর্মের সিংহদ্বারে নিজেকে উৎসর্গ করেছে। কিন্তু বন্ধনের সনাতন প্রথাকে উচ্ছেদ করবার চেষ্টা কেউ করেছে কিনা

বিপাশার জানা নেই। তার কথা শুনে আহত হয়েছে ফ্র্যাঙ্ক। তার কথা হয়তো মানবে না একটি লোকও।

কিন্তু যদি মানত তাহলে স্ত্রী-পুরুষের আকর্ষণ সুন্দর হত—সার্থক হত—নিঃস্বার্থ হত। অধিকার-বোধের প্রশ্ন গৌণ হয়ে দীপ্ত হত জীবন।

ভাবনার শেষ নেই বিপাশার। অন্ধকার কেবিনে ঢেউ-এর দোলায় দুলতে দুলতে তবু কখন একসময় তন্দ্রা এসেছিল—কখন বুজে এসেছিল দুই চোখ। কিছুক্ষণের জন্যে তার চিন্তার রাজ্যে যেন কঠিন এক যবনিকা নেমে এসেছিল।

হঠাৎ রূঢ় একটা চমকে বিছানার ওপর উঠে বসে বিপাশা।

তীক্ষ্ণ অ্যালার্ম বেজে উঠেছে। স্থির জাহাজ। একেবারেই দুলছে না। মাঝ রাতে প্রত্যেক যাত্রী যেন জেগে উঠে কোলাহল শুরু করেছে।

কেবিনের বাইরে অনেকের দ্রুত পায়ের শব্দ। মাইকে ভেসে আসছে ক্যাপ্টেনের বিচলিত কণ্ঠস্বর। কিন্তু তার ঘোষণার এক বর্ণও বুঝতে পারছে না বিপাশা।

লাফিয়ে সে বিছানা থেকে নামে। টক করে সুইচ টেপে। বুক কাঁপছে আশঙ্কায়। কি হল এত রাতে?

শাড়ি ঠিক করে কেবিনের দরজা খুলে সে বাইরে বেরিয়ে আসে। বোধহয় জাহাজের প্রত্যেক যাত্রী জমা হয়েছে ডেকে এসে। সে একাই যেন দরজা বন্ধ করে ঘুমচ্ছিল এতক্ষণ।

সমুদ্রের অন্ধকারে পড়েছে অনেক সার্চলাইটের আলো। কয়েকটা নৌকো ভাসছে। জাহাজের আরও কর্মচারী দড়ি বেয়ে লাইফ-বেল্ট বুকে নিয়ে জলে নামছে। তীক্ষ্ণ অ্যালার্ম বেজে চলেছে এখনও।

তবে কি জাহাজ ডুবছে?

দু-এক পা এগিয়েই অবনী ঘোষালের মুখোমুখী দাঁড়ায় বিপাশা। এপাশে-ওপাশে তাকিয়ে দেখে—সুরমা কোথাও নেই। ভীত দৃষ্টি অবনী ঘোষালের। ঝুঁকে পড়ে কি দেখছে।

তার কাছে এসে বিপাশা জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে ?

ভয়ে-ভয়ে উত্তর দেয় অবনী ঘোষাল, একজন প্যাসেঞ্জার জলে পড়ে গেছে তাই—

কঠিন একটা চমকে দেহ সোজা হয়ে যায় বিপাশার, কে ?

এখনও বোঝা যাচ্ছে না—

অবনী ঘোষালের সারা শরীরে সব ভুলে সন্দেহের দৃষ্টি বুলিয়ে নেয় বিপাশা, সুরমা কোথায় ?

ম্লান হেসে অবনী ঘোষাল বলে, ওদিকে মেয়েদের সঙ্গে আছে—

বিপাশা গটগট করে এগিয়ে যায় সামনে। প্রত্যেকটি মানুষকে যেন খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখে। সকলেই তো আছে তার আশেপাশে। গেইল রজার্স ইংগে অমর সিং সুরমা আর অবনী ঘোষাল। সমরও আছে।

তাহলে কে নেই ?

কেউ উত্তর দিতে পারে না। সকলের মুখেই এক প্রশ্ন, কে জলে পড়েছে ? কে ?

কিন্তু জানতেই হবে তার নাম। ব্যস্ততা আর কোলাহল ভেদ করে বিপাশা ছুটে যায় ট্যুরিস্ট ক্লাসের দিকে। এখন কোন নিয়ম নেই। যাত্রীরা ছড়িয়ে আছে যেখানে খুশি। অজগর-ঢেউএর দিকে তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টিতে।

কাকে গ্রাস করল সমুদ্র ?

তাকে কি আর ফিরে পাবে এই জাহাজ ?

না। কিছুতেই না। যে-ই পড়ুক উত্তাল সমুদ্রের মুখে আর আলো জ্বেলে যতই খোঁজাখুঁজি চলুক—তাকে যে আর ফিরে পাওয়া যাবে না সে-বিষয় কোন সন্দেহ থাকে না বিপাশার।

তাকে দেখে জান্নু ছুটে আসে, মনীষা কোথায় ?

তুমি জান না ?

না। আমি সব জায়গা খুঁজে দেখেছি, হাঁপাতে হাঁপাতে জান্নু বলে, সে কোথাও নেই—

থরথর করে কেঁপে ওঠে বিপাশার দেহ। তারপর অনেকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সমুদ্রের দিকে। যদিও ক্যাপ্টেন এখনও কোন নাম ঘোষণা করে নি তাহলেও এবার বিপাশার বুঝতে দেরি হয় না যে মনীষা আত্মহত্যা করেছে।

ব্যাকুল প্রশ্ন করে জান্নু, কি হবে ?

কি বলবে বিপাশা ? কোন ভাষায় সান্ত্বনা দেবে জান্নুকে ? বধির হয়ে গেছে বিপাশা। মূক হয়ে গেছে।

এ কী করল মনীষা ! এমন করেই কি ব্যক্তিগত অন্তর্দ্বন্দ্ব নিবিয়ে ফেলতে হয়। কার কি লাভ হবে তার এই নাটকীয় অন্তর্ধানে !

আপনি আমাকে বুঝিয়ে দেবেন, আর্ত চিৎকার করে ওঠে জান্নু, কেন—কেন মনীষা মরল ?

জান্নু—

আমি কী করেছি—আমি কী করেছি ! রেলিঙে মাথা ঠুকে-ঠুকে জান্নু প্রতিবাদ জানায়। ছটফট করে। আর ওর চোখ দুটো হঠাৎ অন্য রকম মনে হয় বিপাশার।

জান্নু, তার দিশাহারা ভাব দেখে যেন জ্ঞান ফিরে আসে বিপাশার, অমন করো না। আগে জান কে—

আমি সব জানি। মরবার হিম্মত এ-জাহাজে আর কারুর নেই। শুধু তারই ছিল—

ঠিক সেই সময় মাইকে ক্যাপ্টেনের ভারী গলার স্বর ভেসে আসে, এই মুহূর্তে প্রত্যেক যাত্রী যেন নিজের নিজের ক্যাবিনে চলে যায়। জরুরী প্রয়োজন।

বার বার এক সুরে একই কথা বলে ক্যাপ্টেন। বাইরের ভিড় কমে যায় দেখতে দেখতে। জান্নু কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকে যেমনকার তেমন। নড়ে না। কথা শোনে না ক্যাপ্টেনের। দংশনে-দংশনে অস্থির হয়ে যতদূর পারে ততদূর ঝুঁকে পড়ে শুধু সমুদ্র দেখে।

তার সঙ্গে আর কথা বলে না বিপাশা। ইসমাইলের কাছে এগিয়ে

গিয়ে তাকে বলে জান্নুর ওপর লক্ষ্য রাখতে। বিস্মিত ইসমাইল যেন বুঝতে পারে না বিপাশার কথা। অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তার মুখের দিকে।

বাঁশ বাজে। আবার নড়ে ওঠে জাহাজ। সার্চলাইটের জোরালো আলো নিবে যায়। অন্ধকার সমুদ্রের গর্জন ছাড়িয়ে শুধু একটি দীর্ঘ-নিশ্বাসের শব্দ কানে ভেসে আসে বিপাশার।

মনীষার দীর্ঘশ্বাস!

সমস্ত জাহাজ হঠাৎ যেন নিবে গেছে। এক-একটা মানুষ ঘুরে বেড়ায় এক-একটা যন্ত্রের মতো। কী আশ্চর্য ক্ষমতা মৃত্যুর! জীবনের রূপ পালটে দেয় এক মুহূর্তে। এত হাসি, এত কোলাহল, যাত্রীদের ক্ষিপ্র চঞ্চলতা—এখন আর কিছু নেই।

সে যেই হোক, উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের এক মেয়ে—অনেকে যার নিন্দে করেছে—ক্রুদ্ধ অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখেছে বার বার—আজ তারই স্মৃতি প্রধান হয়ে উঠেছে তাদের মনে। বিপাশার কাছে এগিয়ে আসে অনেকে। কোন প্রশ্ন করে না। নিঃশব্দে বুঝিয়ে দেয় তাদের শোক।

প্রত্যেকটি মানুষ যেন হাসতে ভুলে গেছে। বিপাশার নিজের মুখেও হাসি নেই। সে হয় চুপচাপ বসে থাকে, নয় ঘুরে-ঘুরে খোঁজে জান্নুকে। তাকে সান্ত্বনা দেয়। সতর্ক দৃষ্টি রেখে পাহারা দেয়।

কাল—ক্যাপ্টেন এখনও ঠিক করে বলতে পারে না কখন—সকালে কি দুপুরে বম্বে বন্দরে জাহাজ লাগবে। ভারতবর্ষ! সকলে নামবে একে-একে। খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে প্রত্যেকের মুখ। মনীষার কথা হয়তো কারুর মনে থাকবে না। জাহাজে তার আত্মহত্যা—রহস্যের একটা দীর্ঘ গল্প হয়ে উঠবে।

কিন্তু কি মনে হবে বিপাশার?

কি মনে হয় তার এখন। আর কেউ না জানুক, হয়তো কোনদিন কেউ জানবেও না—কিন্তু সে তো জানে কেন বাঁচতে পারল না মনীষা—কেন—কিসের যন্ত্রণায় সে হারিয়ে গেল সমুদ্রের অন্ধকারে।

তবু কোনমতেই মনীষাকে ভুলতে পারে না বিপাশা—তাকে ক্ষমা করতে পারে না।

তার জীবনের চেয়ে সংস্কার বড় নয়, তার আত্মার কামনাকে কোন নিয়মই যে ছাড়িয়ে যেতে পারে না সেকথা বুঝে কেন সে মেনে নিল না মনের দাবী—কেন দুঃসাহসী হয়ে স্বীকার করে নিল না জান্নুকে।

আর ঠিক এই মুহূর্তে যদি তাকে পাঁচজনের সামনে স্বীকার করা এতই দুঃসাধ্য হয় মনীষার পক্ষে তাহলে কেন সে নিল না দীর্ঘ সময়—কেন নিজের মনকে দিন রাতের বিশ্লেষণ দিয়ে সজীব করে তুলল না।

এমন করে সে যে সব সমস্যার সমাধান করবে তা যদি বিপাশা আগে কল্পনা করতে পারত তাহলে হয়তো কাল বিকেলে যুক্তির এক একটি ফুল ফুটিয়ে দৃষ্টি স্বচ্ছ করে তুলত মনীষার তৃতীয় নয়নের। মনীষার মৃত্যুর জন্যে হঠাৎ বিপাশা যেন নিজেকেই দায়ী করে। আর সমুদ্র দেখে—যে-সমুদ্র মনীষাকে গ্রাস করেছে সেই সমুদ্র।

রজার্সকে এড়িয়ে-এড়িয়ে বেড়াত গেইল। জলে যে-খেলা খেলেছিল সে—তার শেষ হোক জলেই। স্থলে নামবে আর এক মানুষ। যেন জীবন্ত এক ভান।

গেইল কোনদিনও তার স্বামীকে একটি কথাও বলবে না। হিসেব করে সাবধানে পা ফেলবে সংসারে। আর তার স্বামী পূর্ণ বিশ্বাসে হয়তো নিজের হৃদয়টাকেই মেলে ধরবে তার সামনে।

মিথ্যায় মিথ্যায় গেইল রঙীন আলো জ্বালিয়ে তুলবে তার সংসারে।

কিন্তু সকাল থেকেই দেখছে বিপাশা আবার এক হয়ে গেছে গেইল আর রজার্স।

যদিও কারুর মুখে হাসি নেই তবুও অলৌকিক জ্যোতির রেখা আছে তুজনের মুখে। চোখে আছে আশ্চর্য দীপ্তি।

ওদের কথা যেন ফুরোয় না।

আর সুরমা?

তার মুখেও আর যন্ত্রণার ছায়া নেই। সমবেদনায় করুণ হয়ে উঠেছে মুখ। বিদ্রোহের আগুন যেন মন থেকে একেবারেই নিবে গেছে।

একা-একা তাকে আর দেখা যায় না কোথাও। অবনী ঘোষাল সব সময় থাকে তার পাশে পাশে।

কি ভাবে অবনী ঘোষাল মনীষার আত্মহত্যা সম্পর্কে? কি কথা বোঝায় সুরমাকে?

কোন ভয় দেখায়?

কিন্তু ভীত মুখ অবনী ঘোষালের। বিষণ্ণ দৃষ্টিতে সতর্কতার ছায়া। মৃত্যুর ভয়ে তার কঠিন মুখ অকস্মাৎ যেন কোমল হয়ে উঠেছে।

যেন তার বিশ্বাস—মনীষার মতো সুরমাও এক কথায় সব বন্ধন আর শাসন তুচ্ছ করে হারিয়ে যেতে পারে ঢেউ-এর গভীরে।

আর সমর?

না, অলগার সঙ্গে সে বোধহয় আর নির্ভয়ে কথা বলতে পারে না। যেখানে উপসংহার নেই সেখানে আর একজনের মনে আশার আলো জ্বেলে কিম্বা বেদনার হিম ছড়িয়ে কোন লাভ নেই।

আসলে ভয় পেয়েছে সমর।

যেন একটু এদিক-ওদিক হলে মৃত্যু এসে হানা দিতে পারে যে-কোন মুহূর্তে। আর তখন কঠিন এক যন্ত্রণা মনকে বাঁধবে পাকে-পাকে। তার চেয়ে কৌশলে সরে যাওয়া ভাল।

হ্যাঁ, সমরকে লক্ষ্য করেই বিপাশা মনে মনে ভাবে, যেখানে সাহস নেই সেখানে সময়ের ওপর নির্ভর করে সান্ত্বনা খোঁজা অনেক ভাল। কিম্বা মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখাও মন্দ নয়।

অলগা আর কতদিন ভাববে সমরের কথা!

ওদিকে নিষ্প্রভ অমর সিং-এর মুখ।

হয়তো ইংগে তার এই বিষণ্ণ দৃষ্টির কোন অর্থ খুঁজে পায় না। তবে সে বোঝে যে পরিকল্পনার আগ্রহ অনেক থিতিয়ে গেছে অমর সিং-এর একদিনেই।

সে শুধু গবেষণা করে। কি কারণে চঞ্চল জীবন্ত একটা মেয়ে পড়ে গেল সমুদ্রের জলে? নেশার ঘোরে এমন কাণ্ড করে নাকি কেউ?

জীবনের ওপর হঠাৎ যেন একটা কালো ছায়া নেমে আসে। দেশে ফিরে ইংগের সাহায্যে লাভ করার কথাটা সে যেন একেবারেই ভুলে যায়।

কি মূল্য জীবনের!

প্রত্যেকের মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে সে যেন ওদের মনের কথা বুঝে নেয়। কঠিন আঘাতে মৃত্যু জীবন-দর্শনটাই যেন বদলে দিয়েছে।

দিক। হয়তো এ-পরিবর্তন ক্ষণিকের। কিন্তু একটি মৃত্যু যদি এত অল্প সময়ের মধ্যে সাংঘাতিক একটা নাড়া দিয়ে যেতে পারে স্বার্থসম্বল অন্ধ এই মানুষগুলোর মনে তাহলে লক্ষ মৃত্যু কী না করতে পারে এই পৃথিবীকে!

মৃত্যুতেই বুঝি খোলে জীবনের রঙ!

একজন মরে, দশজন বাঁচে। দশজন যায়, সহস্র আসে। জীবনকে নাড়া দিতে—অন্ধ দাম্ভিক মানুষের চোখ খুলে দিতে অনেক মৃত্যুর প্রয়োজন।

কিন্তু তবু মনীষাকে ক্ষমা করতে পারে না বিপাশা।

কেন পারে না—কে জানে!

একসময় বিপাশার কাছে এসে সাবধানে এদিক-ওদিক তাকিয়ে চাপা স্বরে প্রশ্ন করে সুরমা, কি হয়েছিল?

কার?

ওই যে, আরও কাছে সুরমা সরে আসে, উনি কি নেশার ঘোরে পড়ে গেছেন না ইচ্ছে করেই—

আমি কেমন করে জানব?

উনি বলেন—

কি?

নেশার ঘোরেই পড়ে গেছেন।

ছোট্ট উত্তর দেয় বিপাশা, হবে। আমি কিছু জানি না, তারপর হঠাৎ অল্প হেসে জিজ্ঞেস করে, আপনি তো সজ্ঞানেই সমুদ্রে লাফিয়ে পড়তে চান—

লাজুক বউ-এর মতো মুখ নামায় সুরমা। বিপাশার প্রশ্ন শুনে তার মুখের দিকে তাকাতে পারে না।

অনেক পরে ফিসফিস করে বলে, আমার রাগের ওসব কথা আপনি ভুলে যাবেন।

যাব, ছোট রুমালটা চোখের কোণে এক মুহূর্তের জন্যে ঠেকিয়ে বিপাশা বলে, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি সব রাগ পড়ে গেল কেমন করে আপনার?

কিছুক্ষণ কথা বলতে পারে না সুরমা। নিজের অশান্তির কথা ঝোঁকের বশে বিপাশার কাছে প্রকাশ করেছে বলে লজ্জা পায়। যেন রাতারাতি মত পরিবর্তনের কথা শুনলে সে তার মতামতের কোন মূল্যই দেবে না।

তবু সে সব কথা বোঝাবার চেষ্টা করে বিপাশাকে, ওঁর জন্যে আমার মাঝে মাঝে খুব কষ্ট হয়, আবার থামে সুরমা, অদ্ভুত এক মানুষ। হ্যাঁ, রাগ ওঁর একটু বেশি বটে। কিন্তু ছেলেদের তো রাগ থাকাই ভাল, বিপাশার দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করে, কি বলেন?

ঠিক ঠিক, বিপাশা সায় দেয়।

রেগে গেলে উনি আমাকে যা-খুশি তাই বলে গালাগাল করেন, কিন্তু সেটাই তো ওঁর চরিত্রের একমাত্র দিক নয়—

তা তো নয়ই।

ওঁর রুক্ষ মেজাজের কথাই আমি আপনাকে বলেছি—আর কতগুলো কথা বোধহয় বলি নি—

বিপাশা বাধা দিয়ে বলে, ওঁর প্রেমের কথাও বলেছিলেন।

তার কথায় প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের সুর ধরতে পারে না সুরমা। উৎসাহ পেয়ে কথার তোড় বেরিয়ে আসে তার জিব ঠেলে, আমাকে না হলে ওঁর এক মিনিটও চলে না।

আর আপনার?

সুরমা হেসে বলে, সব কথা তো ঠাণ্ডা মাথায় খোলাখুলি বলা যায় না। আমি জানি যে আমি না থাকলে কী ভীষণ অসুবিধা হবে ওঁর!

ওঁকে ছেড়ে যাবার কল্পনাই বা আপনি করবেন কেন!

বিপাশার কথা যেন শুনতে পায় নি এমনভাবে সুরমা বলে, আর সকাল থেকে দেখছি কী যে হয়েছে ওঁর—আমাকে সব সময় চোখে চোখে রাখতে চান! কেন জানেন?

না তো।

ওঁর ভয়—আমিও বুঝি সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি।

তাই নাকি?

সুরমা এবার সুন্দর করে হাসবার চেষ্টা করে, আপনিই বলুন, ওঁর মতো মানুষকে একা ছেড়ে আমি কি কখনও মরতে পারি!

এখন কিছু না বললেও চলে বিপাশার। কথার উৎস খুঁজে পেয়েছে সুরমা। সে অনর্গল কথা বলে যাবে। বিপাশার শুনতে ভাল লাগুক বা না লাগুক সেকথা বোঝবার অবসর হবে না সুরমার।

স্বামীর যে-অবহেলা আর অনাদর তিলে-তিলে তার উপবাসী মনে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে তুলেছিল—মাত্র একটি মৃত্যুতে তা নিবে গেছে।

এখন সুরমা সুখী। যা-ই করে থাকুক অবনা ঘোষাল, তার ভয়-ভয় ভাব মাতিয়ে তুলেছে সুরমাকে।

তাই মৃত্যু-থমথম জাহাজেও শোকের ছায়া তুচ্ছ করে নিজের সঞ্চয় সযত্নে আগলে রাখে সুরমা। বিপাশাকে সহজ ভাষায় জানিয়ে দেয় তার সৌভাগ্যের কথা।

কিন্তু সুরমা কি বুঝতে পারে যে তার এই থরোথরো আনন্দের মূলে রয়েছে মনীষা।

না বুঝলেও ক্ষতি কী!

ফস করে একটা সিগ্রেট ধরায় ইংগে, আমি ভাবতে পারি নি এমন একটা কাণ্ড এ-জাহাজে ঘটবে।

উদাস চোখে বিপাশা বলে, কেউই ভাবতে পারে নি ইংগে।

অমর সিংকে দেখা যাচ্ছে একটু দূরে। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে অবনী ঘোষালের সঙ্গে কি গল্প করছে সে। আবার জাহাজে শুরু হয়েছে কোলাহল। বিদেশী যাত্রীরা হুড়োহুড়ি করছে। বিলিতী গানের সুর ভেসে আসছে।

সেই এক প্রশ্ন করে ইংগে, এটা কি দুর্ঘটনা?

বোধ হয়।

কিন্তু কেউ-কেউ বলছে আত্মহত্যা?

ম্লান মুখে বিপাশা বলে, আমি জানি না।

আস্তে আস্তে সিগ্রেট টানে ইংগে, ভারতবর্ষে যেতে আমার ভয় লাগছে কিন্তু—

কেন?

এত ভাবপ্রবণ তোমাদের দেশের লোক!

আমাকেও কি তোমার তাই মনে হয়?

না। ওকেও তো মনে হত না। সে-ই তো ছিল সব চেয়ে হাসিখুশি—কি দুঃখ ওর তুমি জান?

না।

অদ্ভুত ভয়ে আমার শরীর হিম হয়ে যায়, থেমে থেমে ইংগে বলে, এত সহজে মরতে পারে তোমাদের দেশের মানুষ। অমর সিং-এর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ইংগে বলে, আমার স্বামীও আর ভাল করে হাসে না—কথা বলে না—কিছুই আমার ভাল লাগছে না। কোথায় আমি চলেছি বুঝতে পারছি না—

বিপাশা হেসে বলে, একজনকে দেখে তুমি সে-দেশের প্রত্যেক মানুষকে বিচার করো না ইংগে। আমরা জানি না সে পড়ে গেছে না আত্মহত্যা করেছে—কিন্তু যা-ই ঘটুক না কেন তার জীবনে—একটা কারণ তো আছে নিশ্চয়ই—

কৌতূহলী হয়ে ইংগে আবার জিজ্ঞেস করে, তুমি কিছু জান নাকি ?

বিপাশা মাথা নেড়ে বলে, না। কিন্তু কারণ না থাকলে যে কিছুই ঘটে না সেকথা তো জানি।

ইংগে কি একটা বোঝবার চেষ্টা করে বলে, তা ঠিক। কিন্তু একটা কথা কি জান ? সে থেমে যায়।

কি ?

কারণ যা-ই ঘটুক। আমাদের কাছে জীবনের মূল্য অনেক। একটা কথা শুধু আমি বুঝতে পারি না যে এমন ভাবে এ-জীবন কেমন করে নষ্ট করতে পারে মানুষ।

তার কথায় সায় দিয়ে বিপাশা বলে, আমিও বুঝি না। বুদ্ধি দিয়েই সব কিছুর বিচার করা উচিত। যদিও আমাদের দেশের অনেক লোক বলে যে মাঝে মাঝে মানুষ এমন এক অবস্থায় পৌঁছয় যার নাগাল বুদ্ধি দিয়ে পাওয়া যায় না—

কিছু না বুঝে ইংগে প্রশ্ন করে, তেমন অদ্ভুত অবস্থায় সত্যি কেউ কি কখনও পৌঁছেছে ?

বলতে পারি না। তবে আমি নিজে এখনও পৌঁছতে পারি নি।

ইংগে দৃঢ়স্বরে বলে, কেউই পারে না।

কেউ-কেউ হয়তো পারে, মৃদু প্রতিবাদ করে বিপাশা বলে, তা না হলে আমাদের দেশের অনেক মানুষ একথা স্বীকার করবেই বা কেন—মানবেই বা কেন!

আমি কোনদিনও একথা স্বীকার করতে পারব না।

ইংগেকে হঠাৎ বিপাশার ছেলেমানুষের মতো মনে হয়। তার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখেই সে বলে, কে কখন কোন অবস্থায় পৌঁছয়—কিছুই বলা যায় না ইংগে। তবে বুদ্ধি দিয়ে যার নাগাল পাওয়া যায় না সে-অবস্থায় পৌঁছলে আমার মনে হয়, মানুষ মরতে চায় না—নতুন করেই বাঁচতে চায়।

বিপাশার সব কথা বোঝে কি না বোঝে ইংগে কে জানে। তার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে সে শুধু বলে, তাই নাকি?

হঠাৎ থেমে যায় বিপাশা। অবনী ঘোষাল আর অমর সিং কথা বলতে বলতে এদিকে এগিয়ে আসছে। তাদের সামনে এসব আলোচনার কি দরকার!

সমর বলে, বিপাশাদি, ভারতবর্ষ এসে গেল!

হ্যাঁ।

এখন ঠিক মতো বাড়ি পৌঁছতে পারলেই হয়।

সমরকে খুব বেশি মূল্য না দিতে পারলেও ওর ওপর কোন বিদ্বেষও নেই বিপাশার। কারণ ও হল সাধারণ বাঙালী ঘরের একটি শান্ত ভাল ছেলে। সাধ আছে, সাধ্য নেই। অন্যায়ের বিরুদ্ধে আড়ালে জোর গলায় প্রতিবাদ জানায় কিন্তু যথাসময় নিজের সুখ-সুবিধার কথা সব চেয়ে আগে ভেবে সতর্ক হয়ে মুখ বুজে থাকে।

বিপাশা বলে, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যেতে পারলেই একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়—কি বল?

মানে, থেমে-থেমে সমর বলে, যা একটা কাণ্ড হয়ে গেল জাহাজে! এখন কার কি হয় বলা মুশকিল।

আর কারুর কিছু হবে না সমর—তুমি নিশ্চিন্ত থাক, সমরের বিবর্ণ মুখের দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নেয় বিপাশা, অলগার মনের অবস্থা এখন কেমন ?

কথা শুনে চমকে ওঠে সমর। বিপাশার স্বরে শ্লেষের মৃদু ঝাঁজ ঠিক বুঝতে পারে। কি উত্তর দেবে হঠাৎ ঠিক করতে পারে না। তারপর কথা দিয়েই নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে। আর কথা বলতে বলতে তাকায় বিপাশার মুখের দিকে।

হ্যাঁ, ভালই। তবে একটু ঘাবড়ে গেছে। ব্যাপারটা কি ঠিক বুঝতে পারছে না বোধহয়।

তুমি কিছু বোঝাবার চেষ্টা করেছ নাকি ?

না না, মানে, বিপাশাদি, এখন ও খুব ব্যস্ত কিনা, তাই ওর সঙ্গে আমি বেশি কথা বলি না।

বুদ্ধিমানের মতই কাজ কর সমর। এখন ভারতবর্ষ এসে গেল—জঞ্জাল পায়ে জড়িয়ে তুমিই বা জাহাজ থেকে নামবে কেন।

ঠিক বলেছেন, বিপাশার কথা শুনে উৎসাহ পায় সমর, মা-বাবার মনে আমি কোন দুঃখ দিতে চাই না। ওঁরা অনেক কষ্ট করে আমাকে বিলেতে লেখাপড়া শিখতে পাঠিয়েছিলেন।

ইচ্ছে করেই ঠোঁটের ফাঁকে হাসির রেখা অনেকক্ষণ রাখে বিপাশা, আর অলগা যদি দুঃখ পায় ?

বেশ জোরেই হাসে সমর। আওয়াজটা বেসুরো শোনায় বিপাশার কানে। সমর বলে, আমার জন্যে ও কোন দুঃখ পাবে না বিপাশাদি। জীবনে অনেক আঘাত পেয়েছে কিনা! যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ—অনেক অবস্থার মধ্যে দিয়ে এসেছে ও। ওর আবার দুঃখ কি!

একটু থেমে সমর বলে যায়, এই জাহাজেই তো কত লোক উঠবে নামবে—কত লোকের সঙ্গে মাতামাতি করবে ও!

বাঃ, বিপাশার ইচ্ছে করে সমরের পিঠটা চাপড়ে দেয়, তোমার

দৃষ্টি একেবারে বৈজ্ঞানিক—অলগার কথা অনেক দূর অবধি ভেবে রেখেছ দেখছি—

তোতা পাখির মতো সমর এখনও বলে, আমি সব সময় পরের কথা ভাবি বিপাশাদি!

আজ রাত ভোর হলেই সমুদ্র মিলিয়ে যাবে। স্থলের পরিধি সীমিত। ইট কাঠ অট্টালিকা আর মানুষের গৌরবের নানা প্রতীক। দৃষ্টি বেশিদূর যায় না। ফিরে আসে। বাঁধা-ধরা জীবনের ছকে মন গুমরে-গুমরে জ্বলে।

আবার কবে সমুদ্রের স্বাদ পাবে বিপাশা!

আজ রাতে ওর ঘুম আসবে না। তবু ও ডেকে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখে না অনেকক্ষণ। কেবিনে এসে বিছানায় গড়ায়। এখনও অনেক দৈন্য জমা হয়ে আছে মনে। তাই সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখতে লজ্জা পায়।

বিপাশা বোঝে না সমুদ্রর বুক থেকে বিদায়-মুহূর্ত যতই ঘনিয়ে আসে ততই তার বুকে হু হু আবেগের ঢেউ কেন আছড়ে আছড়ে পড়ে!

কেন হাওয়ায় ভেসে আসে মনীষার তপ্ত নিশ্বাস! আর ঢেউ-এ ঢেউ-এ তারই চলার চঞ্চল ছন্দ কেন বিপাশার মুখে করুণ একটা রেখা ফুটিয়ে তোলে!

মনীষা নেই। কিন্তু বিপাশা আছে।

একজন পারে নি নিজের সংস্কার জয় করতে। কিন্তু সমুদ্রের ঢেউ-এ মিলিয়ে গিয়ে আর একজনকে দিয়ে গেছে ক্ষিপ্র উদ্দাম গতি—কঠিন প্রাচীরের দীর্ঘ সারি ভেঙে মুক্ত প্রান্তর-রঙ্গে মেতে ওঠার দুর্জয় সাহস। শুধু জীবন আর জীবনের কলোচ্ছ্বাস!

মনীষা পারে নি কিন্তু বিপাশা পারবে!

একজন পারে নি বলেই আর একজন পারবে।

* * *

অনেক রাতে গেইল ফিরে আসে কেবিনে। একটু-একটু পা কাঁপে ওর। গায়ে উগ্র গন্ধ। এপাশে-ওপাশে তাকায়। বোধহয় ভয় পায়। বিপাশার কপালে হাত দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করে ও জেগে আছে কি-না। আলো জ্বালাতে গিয়েও জ্বালে না।

কি গেইল?

আমার ভয় লাগছে।

কেন? কিসের ভয়? বিপাশা উঠে বসে।

আর একজন এসেছে এখানে, বিপাশাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে গেইল কাঁপে, ওই দেখ, একটা ছায়া কাঁপছে—আমাকে সব সময় ওই ছায়া অনুসরণ করে ফিরছে—

ও কিছু না। তোমার মনের ভুল গেইল।

তুমি আলো জ্বেলে দাও—প্লিজ!

বিপাশা হাত বাড়িয়ে সুইচ টেপে। তারপর ভাল করে গেইলকে দেখে। সোনালি চুল এলোমেলো। চোখ দুটো লাল। নেশার ঘোরেই ভয় পেয়েছে। সারারাত বোধহয় প্রলাপ বকবে।

ঘুমবে না গেইল!

ছোট হাই তুলে গেইল বলে, না। জেগে থাকব। আর তোমাকেও জেগে থাকতে হবে আমার সঙ্গে।

থাকব।

কিন্তু কাল, বিপাশার কোলে মাথা রেখে গেইল আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ে, কাল কি হবে?

কাল? মধুর হেসে বিপাশা বলে, বম্বে পৌঁছে যাবে। আর তোমার স্বামীর কোলে মাথা রেখে গল্প করবে—

গেইল উঠে বসে আবার। শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকে বিপাশার দিকে। হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে।

আর রজার্সের কি হবে?

যেন বিস্ময়ের ঘোরে বিপাশা জিজ্ঞেস করে, কার?

কাঁদতে কাঁদতেই গেইল বলে আবার, রজার্স—কাল থেকে কি হবে রজার্সের ?

উত্তর দেবার ভাষা নেই বিপাশার।

কেবিনের আলো জ্বলে সারারাত।

দুপুরের অনেক আগেই জাহাজ বন্দরে লাগল।

এবার নামতে হবে। কোলাহলে মুখর হয়ে উঠেছে জাহাজ। ভূমির কঠিন স্পর্শ পাবার জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠেছে যাত্রীদের মন। মালপত্র গুছিয়ে তাড়াতাড়ি নামবার আগ্রহে ব্যস্ত প্রত্যেকে।

যে-সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এ-কদিনের সমুদ্রযাত্রায় যেন তা মুহূর্তে ছিন্ন হয়েছে স্থলের সঙ্কেতে। এখন আর কারুর দিকে ফিরে তাকাবে না কেউ। লৌকিকতার পালাও শেষ।

কিন্তু বিপাশা একদিকে দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ। যেন বুঝতে পারে না জাহাজ চলছে কি থেমেছে। মনের মধ্যে গতির চঞ্চল প্রবাহে এখনও সে অক্লান্ত।

সে শুধু একজনকেই খোঁজে।

কিন্তু জান্নু কোথাও নেই। তাকে দেখতে পায় না বিপাশা। তবু অপেক্ষা করে দেখতে চায় তার রূপান্তর। মনীষার মৃত্যু যেন মনে হয় মুছে গেছে ভূমি-স্পর্শ-উন্মুখ যাত্রীদের মন থেকে।

কিন্তু জান্নুর মনেও কি বিষাদের কোন রেখা নেই ?

কাল সারাদিনের মধ্যে একবারও ইচ্ছে করেই ট্যুরিস্ট ক্লাসের দিকে যায় নি বিপাশা। মনীষার মৃত্যু সম্পর্কে ওদের সকলের প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে চেয়েছে বলেই যায় নি।

তাছাড়া জান্নুর শোকজর্জর ছন্নছাড়া মূর্তিটাও দেখতে চায় নি। বিপাশা শুধু তার নিজের কথাই ভেবেছে আর সমুদ্র দেখেছে—দেখতে দেখতে অনুভব করেছে মনীষাকে। সকলে তাকে ভুললেও বিপাশা ভুলতে পারবে না।

এমন প্রগাঢ় অনুকম্পার তার যে বাঁধা আছে বিপাশার মনের গভীরে তা সে নিজেই জানত না।

চেনা আধচেনা অচেনা মানুষগুলো সরে গেল একে-একে সাবধানে পা ফেলে-ফেলে গুনে-গুনে জিনিসপত্র গুছিয়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল।

কেউ হাসল বিপাশার দিকে তাকিয়ে। কেউ হাত নাড়ল। কেউ ঠিকানা দিয়ে বলল, কলকাতায় গিয়ে আবার দেখা হবে।

শেষবারের মতোই লৌকিকতার ভিজে হাসি হাসল বিপাশা। ওদের অলক্ষ্যে ঠিকানা লেখা কাগজ ছুঁড়ে দিল সমুদ্রের জলে।

ও জানত ওদের কারুর সঙ্গে আর তার দেখা হবে না। দেখা হলেও চিনতে কষ্ট হবে পরস্পরকে—দ্বিধা হবে। পথে-প্রেক্ষাগৃহে দু-একটা কথা হলেও আলাপ জমবে না।

সকলেই চলে গেল বিপাশার চোখের সামনে দিয়ে। শুধু একজনকে দেখতে পায় না সে। তখন বিপাশা খুব আস্তে আস্তে ট্যুরিস্ট ক্লাসের দিকেই এগিয়ে যায়।

শূন্য জাহাজটা বন্দরে ঝিমোয়। গায়ে লেগে আছে শুধু সমুদ্রের ঘ্রাণ। কড়া রঙের একটা প্রলেপ পড়লে তাও মুছে যাবে।

এখন দেখলে মনেই হয় না যে এই জাহাজ আবার হাজার-হাজার মাইল পার হয়ে যেতে পারে সমুদ্রে ভেসে-ভেসে দেয়ালির আলো জ্বালিয়ে অসংখ্য যাত্রীর বুকে উন্মাদনার উদ্দাম ঢেউ জাগিয়ে।

বন্দরের এই ক্লান্ত রিক্ত জাহাজটাই কি সমুদ্রের সেই জাহাজ!

নিষ্প্রাণ এক কঠিন মূর্তির মতো অগোছাল মালপত্রের ওপর গালে হাত দিয়ে জান্নু বসে আছে। নড়ে না। কোনদিকে তাকায় না। জাহাজ ছেড়ে বন্দরে নামবার যেন কোন আগ্রহ নেই ওর।

দূর থেকেই ওকে দেখতে পায় বিপাশা। তাড়াতাড়ি পা ফেলে এগিয়ে আসে ওর কাছে। কি কথা বলবে ঠিক করতে পারে না।

ভেঙে পড়া এই মানুষটাকে দক্ষ শিল্পীর মতো ও যেন জোড়া দিতে চায়।

জান্নু!

কোন উৎসাহ প্রকাশ না করে জান্নু শুকনো সাড়া দেয়, কি?

বন্দর এসে গেছে। নামবে না?

সংক্ষিপ্ত উত্তর, না।

কেউ নেই কোথাও। কেউ দেখছে না ওদের। কিন্তু অনেকে ওদের দেখলেই যেন খুশি হত বিপাশা। খেয়াল মেটাবার জন্যে নয়, কোন দুর্ঘটনার মধ্যে দিয়ে নয়, নিরুপায় হয়েও নয়, উপলব্ধির জ্যোতিতে সম্পূর্ণ হয়েই বিপাশা এসেছে জান্নুর কাছে।

চল জান্নু, তার পাশে বসে পড়ে বিপাশা বলে, অনেকক্ষণ সময় হয়ে গেছে। এবার নামতে হবে। ওঠ, জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও!

না, যন্ত্রণায় কাঁপা-কাঁপা স্বর জান্নুর, এ-জাহাজ ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। যতদিন প্রাণ থাকবে ততদিন আমি শুধু সমুদ্র দেখব—

কী কথা যেন মনে মনে ভাবে বিপাশা! জান্নুর একটা হাত ধরে কোন সঙ্কোচ না করে, আরও এক সমুদ্র আমি তোমাকে দেখাব—

বিস্মিত চোখে জান্নু দেখে বিপাশাকে, কোথায় সেই সমুদ্র?

তোমার মনে, বিপাশা উঠে দাঁড়ায়। আকাশ দেখে একবার, চল নেমে যাই। আর দেরি করো না।

জান্নুও ওঠে। ইশারায় কুলি ডাকে। মালপত্র গুছিয়ে নেয়। আর একটাও প্রশ্ন করে না বিপাশাকে।

কিন্তু তারও মন জুড়ে সত্যিই যে এক বিশাল সাগর উথলে ওঠে জান্নু বোধহয় জীবনে প্রথম বিপাশার কথায় তা অনুভব করে।

জান্নুর হাত ধরেই এগিয়ে যায় বিপাশা। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে কেউ একটাও কথা বলে না। শুধু শেষ ধাপে পৌঁছে পিছন ফিরে ফাঁকা জাহাজটাকে আর একবার দেখে নেয় বিপাশা।

আর বন্দরে পা ফেলবার ঠিক আগের মুহূর্তে কাদের কথা ভেবে আপন মনেই হাসে।

অমৃতের লোভ দেখিয়ে যারা নিয়মে বন্ধনে কৃত্রিমতায় জীবনকে করল বিষময়—তাদের মিথ্যা সুখের অলীক স্বর্গ তাদেরই থাক!

অমৃতের শূন্য কুম্ভের ভারে ক্ষয়ে যাক তারা—শেষ হয়ে যাক!

বিপাশার জন্যে থাক অপার এক পারাবার।

বিষ হোক সুধা জীবনের অকৃত্রিম দাবীর ছোঁয়ায়!